KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ আষাঢ়, ১৩৫৭ শ্রাবণ, ১৩৫৭ ভাদ্র, ১৩৫৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 August '60 (0.50) SAMAKALIN

★ A R U N A ★

ARUNA MILLS
MARINA

more DURABLE
more STYLISH

SPECIALITIES

Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH

Printed :
Voils
Lawns Etc.

in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

★ A R U N A ★

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অষ্টম বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৬৭

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আগামীর
প্রস্তুতি

খোকা আজ আর খোকা নেই। আজ সে বড়
হয়েছে। দু'দিন পরে বাবার মতো ওকেও অনেক দায়িত্ব নিয়ে
এগিয়ে আসতে হবে সংসারের মরা-বাঁচার সংগ্রামে।.....
বৃদ্ধ বাবা আজ ক্লান্ত। কপালের ভাঁজে ভাঁজে তার বার্দ্ধক্যের ছাপ।
জীবনের সব অভিজ্ঞতা, সব সঞ্চয় দিয়ে খোকাকে সে বড় করে
তুলেছে। তাঁর বুক ঢালা স্নেহের ছায়ায় দিনে দিনে ছোট্ট চারাটির
মতো বেড়ে উঠেছে খোকা, আর জেনেছে জীবনের
কঠিন সত্যকে—বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম।
এ শুধু আগামীরই প্রস্তুতি। আজকের এই মহান
সংগ্রামই যে একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীকে আনন্দ সুখের
উজ্জ্বাসে হাসি গানের উৎস করে গড়বে।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র
পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে।
তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে
মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের
সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি, আমাদের
নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে—

আজও আগামীতেও...দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR. 4-X52 BG

অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

সমকালীন

ভাদ্র তেরশ' সাতষট্টি

॥ সূচীপত্র ॥

নাট্যশাস্ত্রের ছায়া-ভূমি। অমিয়নাথ সান্যাল ২৫৭

অতিমানববাদ ও ফ্রেডারিক নীৎসে। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ২৬৮

ক্লাসিসিজ্‌ম্‌। দেবব্রত চক্রবর্তী ২৭৪

রবীন্দ্ররচনা-সূচী। পুলিনবিহারী সেন ও পার্থ বসু ২৮১

কোন আদিকাল হতে। সোমেন বসু ২৮৯

কাব্য সমালোচনার ধারা। গীতা ঘোষ ২৯২

সমালোচনা—রতন সান্যাল, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত,
নরেন্দ্রকুমার মিত্র ২৬৯

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্‌ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

শোনা যায় যে প্রায় ১২ বছর ধরে কাজ করে ১২০০ সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী মিলে তেরশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কোণারক মন্দির তৈরী করেছিল।

যে কোন ভাবে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে এরূপ বিরাট ইমারৎ তৈরীর কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটি সহজেই অনুমেয় যে গৃহাদি নির্ম্মাণের কাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রি এবং কর্ম্মীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছিল।

অতীতের ন্যায় আজও যে কোনো বিরাট পরিকল্পনার আওতায় বহু স্থায়ী শিল্পালয়ের উন্নতি হয়েছে এবং আরও বহু নতুনের উৎপত্তি হচ্ছে—যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিও দিন দিন বেড়ে চলেছে। স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকিউয়ামের পদ্ধতি

হল যে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনমত লোকবল ও দ্রব্যাদির জন্য যতদূর সম্ভব দেশীয় সাহায্যই নেবে। ১৯৫৯ সালে তাদের ভারত হতে ক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য হয়েছিল ৩৪৬ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ২৮৯ লক্ষ টাকা মার্কেটিং অরগানাইজেশনের জন্যে এবং ৪২ লক্ষ টাকা রিফাইনিং অপারেশনের জন্যে। স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকিউয়ামের মোট তিনটি অপারেশনের প্রয়োজনে পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত, সবশুদ্ধ খরচ হয়েছে ১৬৫৯ লক্ষ টাকা। স্ট্যানভ্যাকের চাহিদার ফলে যে সমস্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে, সেগুলি হল আলকাতরা ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি রাখার জন্যে ড্রাম ও পিপা; গ্যাসোলিন পাম্প এবং আধুনিক ট্যাঙ্ক-ট্রাক্‌স্ এবং এয়ার ক্র্যাফট রিফিউয়েলারস্।

স্ট্যানভ্যাক—ভারতের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করিছে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকিউয়াম অয়েল কোম্পানী সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সহিত ইউ এস এ তে সম্মিলিত

PSVOC-118/60-BEN

অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা সমকালীন ভাদ্র তেরশ' সাতষট্টি

নাট্যশাস্ত্রের ছায়া-ভূমি

অমিয়নাথ সান্যাল

নাট্যশাস্ত্রের ছায়া-ভূমিকা অংশের সাধারণ পরিচয় জানা থাকলে সংগ্রহ-শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করা সার্থক হয়। ছায়া-ভূমিক অংশ অর্থাৎ চৌ-সং ১ম অধ্যায় থেকে ৫ম অধ্যায় ইতি পূর্বপ্রস্থ এবং ৩৬ অধ্যায় ইতি পশ্চিম প্রস্থ।

একটি উপমা প্রয়োগ করলে ক্ষতি নেই। সুবৃহৎ পূর্ণাবয়ব একটি বৃক্ষের উপরে মাধ্যন্দিন সূর্যের অবস্থান কালে বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষের কান্ডসংলগ্ন হয়ে বৃক্ষের মতো মন্ডলাকার ধারণ করে। কিন্তু সূর্য পশ্চিম দিকে অবনীয়মান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াও পূর্বদিকে কিছু প্রলম্বিত হয়, পশ্চিম দিকে কিছু সঙ্কুচিত হয়।

আমরা মনে করতে পারি, যে কালে ভরত মুনি সাক্ষাৎ উপদেষ্টা রূপে বর্তমান ছিলেন, সে কালে গুর্বাচারসিদ্ধ নাট্য-গান্ধর্ব বৃক্ষের শীর্ষদেশে জ্ঞান-ব্যবহার সমুজ্জ্বল মাধ্যন্দিন প্রতিভা সূর্য প্রতিভাত ছিল।* যেমনটি কায়া তেমনটি ছায়াও ছিল। সেই মধ্যাহ্নকালীন যুগে বৃক্ষ-চ্ছায়ার আশ্রয়ে বসে ভরত মুনি নাট্য-গান্ধর্ব উপদেশ করেছিলেন। ভারত-উপাধিযুক্ত সূত্রধার-প্রমুখ শিষ্য-শ্রোতৃগণ সাক্ষাৎ উপদেশ অবলম্বন করে সংগ্রহ-শাস্ত্র বিরচন করেছিলেন। সংগ্রহের আলোচনাই ছিল নাট্য-গান্ধর্বের উপনিষদ্। উপ অর্থাৎ গুরুর সমীপে নিষৎ অর্থাৎ শিষ্য-শ্রোতৃবৃন্দের আগমন ও আসন গ্রহণ।

ভরত মুনির তিরোধানের পরে, নাট্যসূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে আরম্ভ করেছিল। ছায়াও পূর্বস্থ হয়ে প্রলম্বিত হয়েছিল। ভরতোত্তর সূরিবৃন্দ তখনও হয়ত' নাট্য-গান্ধর্ব উপনিষদ্-সংসদে মিলিত হতেন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পরম্পরা ক্রমে ভরত মুনির আসনে উপবেশনাধিকার লাভ করে 'ভরত' উপাধি দ্বারা বিশেষিত হতেন।

কালক্রমে ভরত-উপাধি প্রণালী নিরুদ্ধ হয়ে গেল। পূর্বগ ভরতদের নাম মাত্র থেকে গেল পান্ডুলিপিতে; হয়ত' বা শ্রুতিরূপে। নাট্য-গান্ধর্বের সূর্য তখন অস্তগমনোন্মুখ। সূত্রধার ও আচার্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। জ্ঞান-প্রয়োগমুখী নাট্য-গান্ধর্ব তখন আশ্রয় সম্বল হয়ে জরতী প্রপিতামহীর ন্যায় নট-নটীপ্রভৃতি প্রপৌত্র সন্তানগণের অঞ্চলধারিণী হয়ে কালাতিপাত করেছেন। এই অবস্থায় কোনও মাধ্যমিক সংসদ্ বা জ্ঞানী সম্পাদকবর্গ আবির্ভূত

হয়ে ক্বচিৎ ছিন্ন ক্বচিদ্ ভিন্ন সংগ্রহ-উপদেশাবলী যথাসাধ্য ভাবে নূতন রূপে সংকলিত করলেন। "নাট্যশাস্ত্র" এই সংকলিত রূপ ও রেখার বিরাট ও ঘনীভূত চিত্র। মূল বৃক্ষের কায়া বস্তুত একই আছে। কিন্তু, সংলগ্ন ছায়া ও প্রদোষের অন্ধকার একসঙ্গে মিশে গিয়েছে। নাট্য-গান্ধর্ব কর্ম বিনষ্ট হয়নি; নেহাৎ হওয়ার নয় বলে। তবে মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ কর্তৃক "নাট্যশাস্ত্র" বিরচিত হওয়ার কালে অধ্যয়ন-অধ্যাপনশীল ব্যক্তিবর্গ নাট্যশাস্ত্রের প্রতি ক্রমশ উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের কোনটি কায়া এবং কোনটি ছায়া এ বিষয়ে পার্থক্য বোধ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্য তখন দূরে দিগবলয়ের অস্পষ্ট লোকালোক-সুলভ অন্ধকারের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে।

মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ বুদ্ধি-বিচার করে কিছু শ্রুতি-স্মৃতি কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য, এবং বিশিষ্ট অথচ সংগ্রহ-বহির্ভূত কিছু সারবান বস্তু আহরণ ও চয়ন করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অর্বাচীন সম্পাদনার কালে (আমার মতে মতঙ্গ প্রণীত "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থ রচনার পরে, এবং কবি অশ্বঘোষ প্রণীত "বুদ্ধচরিত" রচনার পূর্বে) ভরত মুনির জীবন-বৃত্তান্ত লোকোত্তর খ্যাতি দিয়ে মণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। ভরত মুনি তখন কথা-কাহিনীতে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকবিহারী ঊর্ধ্বগ পুরুষ হয়ে গিয়েছেন। যেমন লোক-খ্যাতি তেমনি অবলোকন প্রয়াস। নাট্য-গান্ধর্বা-মোদী লোকেরা যে ভরতকে ঈশ্বর-পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করতে আরম্ভ করেনি, এটা হল নাট্যশাস্ত্রের পরম ভাগ্য। নচেৎ নাট্যশাস্ত্র প্রাচীন কালের ভক্তি-উপাসনামূলক বিচিত্র আম্নায়-শাস্ত্র রূপে আজ গবেষণার বিষয় হ'ত।

ছায়া-ভূমিক অংশের মধ্যে ১ম অধ্যায়গত 'নাট্যবেদ' কাহিনী, ২য় অধ্যায়গত 'প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ বিধি' ৩য় অধ্যায়গত 'রঙ্গদেবতা-পূজন বিধি', ৪র্থ অধ্যায়গত "তান্ডব-লক্ষণ" এবং ৫ম অধ্যায়গত "পূর্বরঙ্গ-বিধি" ইতি পূর্বপ্রস্থ ছায়া। এবং ৩৬ অধ্যায়গত "নাট্যাবতার" ইতি সংক্ষিপ্ত ও পশ্চিমপ্রস্থ ছায়া। এই ছয়টি অংশের মধ্যে ১ম অধ্যায়ে শ্রৌতবার্তার আশ্রিত কথা-কাহিনী-সংলাপ যোজনা ও রম্য-রচনার প্রয়াস অধিকতর ও স্পষ্ট।

যাই হক, ছায়া-ভূমিক অংশের মধ্যে কথা-কাহিনীর অবকাশে শ্রুতি-স্মৃতিমণ্ডিত ঐতিহ্যের বীজও আছে। এই ঐতিহ্য অবহেলা করা যায় না।

যথা, ১ম অধ্যায় ২৪ শ্লোকে ভরতের একশত পুত্র বিষয়ে উল্লেখ আছে। পরে কথাচ্ছলে প্রসঙ্গও আছে। ২৬ শ্লোক থেকে ৩১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে পুত্রগণের নাম উদ্ধৃত আছে। এর পরেই কথারম্ভে বলা হয়েছে "পিতামহের (ব্রহ্মার) আজ্ঞায়, তথা স্বর্গাদি ত্রিলোকের গুণ সকল গ্রহণ করার ইচ্ছা নিবন্ধন ('লোকস্য চ গুণোৎসয়া') উক্ত একশত পুত্র যথা-ভূমিবিভাগত (যে যেমন ভূমির যোগ্য তাকে সেই ভূমি সাধন কর্মে) নিয়োজিত হয়েছিল।" ভূমি অর্থ ভূমিকা বা পাত্র নয়। **ভূমি অর্থ নাট্যের আশ্রয় ভূমি, পরিবেশ;** যথা দিব্যাশ্রয় বা স্বর্গাদি দিব্যভূমি। অনুরূপ ভাবে মর্ত ও পাতাল। গূঢ় অভিপ্রায় এই যে—স্বর্গ হক, বা মর্ত্য, বা পাতাল হক

---

* সমগ্র নাট্য-শাস্ত্র বার বার পড়ে এবং উপদেশের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুলক্ষণ, বস্তুরচনা ও বস্তুপ্রয়োগ বিধি অনুধাবন করে, আমার পক্ষে অনারূপ অনুমান সম্ভব হয়নি। অনারূপ যথা, নাট্যশাস্ত্রীয় বিষয়বস্তু বিধি সমস্তই কল্পনাপ্রসূত; এবং জ্ঞান-ব্যবহারগত বাস্তবসমৃদ্ধি কোনও কালেই ছিল না।

শিষ্য-শ্রোতৃবৃন্দ যখন বৈঠক ছেড়ে অন্যত্র নাট্য পরিকল্পনার নিমিত্ত মিলিত হ'তেন, তখন দেখা দিত **নাষ্ট সংজ্ঞ** (২৭ অঃ ৫৬-৫৭ শ্লোক, ৩৬ অঃ ৩১ শ্লোক)।

নাট্যকার পক্ষে এ সকল আশ্রয়ের স্বরূপ-সংস্থান, অধিবাসী ও চরিত্র বিষয়ে তথ্য সন্ধান ও আহরণ করা উচিত। এর মধ্যে—স্বর্গ ও পাতাল রহস্য পুরাণ ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের অধিগত, এবং কিছু হ'ল শ্রুতি-স্মৃতি-কিম্বদন্তীগত। এ সকল তথ্য জানা থাকলে নাটকাদির নায়ক উদাহৃত হ'তে পারে। এবং মর্ত্যলোক অর্থাৎ **তখনকার ভারতভূমি** (১৪ অঃ ভারত ও ভারতের বর্ষ, তথা দাক্ষিণাত্য, অবন্তি, ঔড্রমাগধ ও পাঞ্চালী দেশবিভাগত ভূমি ভেদ) বলতে ভূমিভেদ-ও অবশ্য গ্রাহ্য। কারণ, ভূমি ভেদ অনুসারে **নাট্যপ্রবৃত্তি** সংস্থাপনীয়; প্রবৃত্তির অনুযায়ী 'বৃত্তি' স্থাপনীয়, এবং বৃত্তির অনুগত রূপে লোকধর্ম ও নাট্যধর্ম প্রযোজ্য।

শতপত্র-ঘটিত এই উল্লেখের পরে, কিন্তু, সমগ্র নাট্যশাস্ত্রে বারান্তরে কোনও পুত্রনাম পঠিত দেখা যায় না। তাতে ক্ষতি নেই। উক্ত ভরত সন্তানগণ নিয়োগ ক্রমে ভারত ও বর্ষে পরিভ্রাম্যমান হয়ে নাট্যপ্রয়োগযোগ্য বহু বিচিত্র তথ্য আহরণ করে ভরত-প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংসদে উপস্থিত করেছিলেন। নাট্যশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের মধ্যে এদের নামোল্লেখ কর্তব্য। কিন্তু—সংকলিত উপদেশের ধারার মধ্যে এঁদের নামোল্লেখের সঙ্গতি নেই। আমি এই অংশটি বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য সংবাদ মনে করি।

নামগুলি কল্পনা প্রসূত নয়। কারণ, উৎকট উদ্ভট নামও আছে। কল্পনা করে কেউ অসুন্দর নাম শাস্ত্ররচনার মধ্যে প্রক্ষেপ করে না। **নামগুলি ভরতের ঔরসজাত পুত্রের নাম নয়।** বহু বিভিন্ন গোত্রভূত নাম আছে। এক ঔরসে বিভিন্ন গোত্র-সিদ্ধি হয় না। ভরতের কালে গোত্রকুলাচার ছিল (৬ অঃ ৪৫ শ্লোকের পর গদ্যাংশে "যথা চ গোত্রকুলাচারোৎপন্নানি আপ্তোপদেশ-সিদ্ধানি পুংসাং নামানি" ইত্যাদি)।

এর পরে 'নাট্যবৃত্তি' উৎপত্তির সম্বন্ধে কাহিনী আছে। প্রবৃত্তি হ'ল বিশদতমা ও সাধারণী; বৃত্তি হ'ল লোকভাব-কর্মসাধারণী। কৈশিকী (কেশপাশ সম্বন্ধীয় কৈশিক; স্ত্রীলিঙ্গে কৈশিকী) বৃত্তি হল সুচারুতমা। ব্রহ্মার মানসে অপ্সরোবিশেষ কৈশিকী-প্রতিনিধিরূপে উদ্ভূত হল ইত্যাদি গল্প (৪৪ শ্লোক থেকে ৫০ শ্লোক স্তর)। নামের মধ্যে প্রথম তিনটি যথা—মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী; তিনটিই কৈশিক! তাহলেও নামের মধ্যে "কেরলা" (কেরলী অঙ্গনা কেশ রচনায় খ্যাত) ও মাগধী নাম দেখে বুঝতে পারা যায়, গল্পচ্ছলে মরলোক-সুলভ বৃত্তির ঐতিহ্যও ধৃত হয়েছে। একেও আমি সারবান ঐতিহ্য মনে করি। কারণ, ২২ অধ্যায়ে, ৪৩ শ্লোকে কৈশিকীবৃত্তির লক্ষণ বর্ণনার সঙ্গে এর উক্ত সম্বন্ধ আছে।

১ম অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকারম্ভে "মহেন্দ্রবিজয়োৎসব" নামে একটি অনুষ্ঠানের কাহিনী আছে। এই অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে "জর্জর" প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্য জড়িত হয়েছে (৬৫ শ্লোক থেকে ৭৬ শ্লোক স্তর)। ধীর নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করলে মনে হয়— ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্যের আদিমতম এমন একটি ঘটনা রেখায়িত হয়েছে, যার মধ্যে ইন্দ্র নামে রাজপক্ষ ও বিঘ্নকারক বা শত্রুস্থলীয় দৈত্যাসুর পক্ষ স্পর্ধা পূর্বক একটি উৎসবে স্ব স্ব কর্তৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিল। সেই ধ্বজযজ্ঞে নাট্য অনুষ্ঠিত হলেও গান্ধর্বের প্রয়াস ছিল না। যাই হক, অসুর পক্ষের মায়েন্দ্রজাল নাশ করার জন্য জর্জর দন্ডধারী ইন্দ্র সভার মধ্যে জর্জর ত্যাগ করেছিলেন, এবং অসুর বর্গ জর্জরীভূত হয়ে হিংসা ত্যাগ করেছিল। পরে সেই জর্জরের সম্বন্ধে মন্ত্রপূত শ্লোক-স্তোত্র রচনাও করা হয়েছিল। জর্জর স্বয়ং একটি অশরীরী আত্মা রূপে গণ্য হয়েছিলেন। কালে, নাট্যসংক্রান্ত পূজাদি কর্মে জর্জর পূজা স্তবাদি ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। ফল কথা, নাট্যবেদ-সমুদ্ধার কাহিনী বিরচিত করার অবসরে ইন্দ্রাদি দেবপক্ষ এবং দৈত্যাদি অসুর পক্ষের পরস্পর ও চিরন্তন হিংসার একটি সামান্য কাহিনীকে নাট্য-ঐতিহ্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করা

হয়েছিল। এই কাহিনীর নাট্যদৃষ্টিগত মূল্য হয়ত আছে। পৃথিবীতে আজও "রুলিং পার্টি" ও "অপোজিশন্ পার্টি'র" দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলচে। "পপীকার" পুরুষের সম্মুখেই ইন্দ্র করকমল-স্পৃষ্ট শ্রীমান জর্জ-দণ্ড আপন মর্যাদায় বর্তমান। মন্ত্রীসভাগুলি মহেন্দ্রবিজয়োৎসবের মূর্তি পরিগ্রহ করে না, এ কথাও আজ বলা যায় না। এবং—সেই আদিমতম ধনুজয়জ্ঞ যেমন গান্ধর্ববিবর্জিত ছিল এখনও তাই আছে। এও একরকমের নাট্য।*

৬ অধ্যায়ে উপদিষ্ট নাট্যসংগ্রহের শেষ বিষয় হল 'রঙ্গ' অর্থাৎ রঙ্গগৃহ-নির্মাণ, রঙ্গ-দেবতাপূজন, ও পূর্বরঙ্গ কর্ম, এই তিন পর্যায়ের উপদেশের মূলাধার। সংগ্রহ-উপদেশের ক্রম-পদ্ধতির মর্যাদা রক্ষা করতে হলে "রঙ্গ"ই হবে, নাট্যসংগ্রহের সমাপ্তিসূচক উপদেশ। অথচ, নাট্য শাস্ত্রে রঙ্গই হল প্রাথমিক উপদেশ।

মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ পূর্বোক্ত পাঁচটি অধ্যায়কে মূল সংগ্রহ উপদেশাবলীর মধ্যে কোনও যোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করতে পারেননি বলেই সর্বপ্রথম পাঁচটি অধ্যায়ের রূপে প্রণীত করেছিলেন। অর্থাৎ—তাঁরা যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন (সংগ্রহ-পাণ্ডুলিপি) তার মধ্যে এই বিষয়গুলি কোনওটিতে গুচ্ছীকৃত, কোনওটিতে খণ্ডীকৃত, কোনওটিতে প্রকীর্ণ রূপে পল্লবীভূত ছিল। এই সমস্যার সমাধান কল্পে তাঁরা বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলিকে সর্বপ্রথম পাঁচ অধ্যায়ের রূপে গ্রথিত করে-ছিলেন। বিষয়বস্তুগুলি সুরক্ষিত হয়েছে সন্দেহ নেই।

৪ অধ্যায়ে "তাণ্ডব-লক্ষণ" উপদেশের মধ্যে কিছু শ্লোক-স্তর গত অসংগতি এবং কিছু আন্তরিক অসংগতি লক্ষ্য হয়। শ্লোকস্তরগত অসংগতি অল্পায়াসেই আবিষ্করণীয়। কিন্তু আন্তরিক অসংগতি অল্পায়াসে আবিষ্করণীয় নয়। আন্তরিক অসংগতির স্বরূপ আলোচ্য। বিশেষ হেতু এই যে, এই সংগতি স্পষ্টীকৃত হলে প্রমাণিত হয় ১ অধ্যায়ের নাট্যবেদ-সমুদ্ধার ইতিহাসটি আদ্যোপান্ত কল্পনাপ্রসূত।।

নাট্যসংগ্রহের বিষয়ের (৬ অঃ ১০ শ্লোক) মধ্যে নৃত্তের স্থান নেই। কি হেতু? নৃত্ত স্বয়ং গান্ধর্বের অধিকৃত ব্যাপার। এক কথায় নৃত্তকে গান্ধর্ব-কর্মের পর্যায়ভুক্ত করতে বাধ্য। প্রথমত, 'গান্ধর্ব' শব্দের ব্যুৎপত্তি, যথা "গন্ধেন নৃত্তেন সহ ইতি গমনং যস্য সো গন্ধর্বঃ (গন্ধ, নৃত্ত+ঋ ধাতু গমনার্থে, যার গমনই হল নৃত্ত)। দ্বিতীয়, ২৪ অধ্যায়ে সত্ত্ব (ব্যক্তিত্ব) ও শীলের (কামক্রোধাদি উত্তেজক কারণ নিরপেক্ষ সংসিদ্ধ, সহজ চরিত্র, ইংরাজি নর্ম্) প্রসঙ্গে ১০১ শ্লোকে গন্ধর্বাঙ্গনা গণের শীল বর্ণিত হয়েছে— গীতে বাদ্যে চ নৃত্তে চ নিত্তং হৃষ্টা মুদাবতী।

গান্ধর্বশীলা বিজ্ঞেয়া স্নিগ্ধত্বক্‌শোলোচনা ।।

অর্থাৎ—গন্ধর্বাঙ্গনাগণ গান্ধর্বশীলা। তাঁরা গীত বাদ্য ও নৃত্তে সর্বদাই উল্লসিত, শুচি-পরায়ণা এবং তাঁদের ত্বক্ কেশ ও লোচন স্বভাবেই স্নিগ্ধ।

ব্যঞ্জনা দ্বারা বুঝতে হবে, গন্ধর্ব-পুরুষগণও গীত-বাদ্য-নৃত্তে সংসিদ্ধ। না হলে গন্ধর্ব পত্নীরা গীত-বাদ্য-নৃত্ত উপভোগ অর্থে আবার কাদের দ্বারস্থ হবেন!

অতএব, নৃত্ত বিষয়ক ঐতিহ্য মূলে গান্ধর্ব-বিষয়ক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। এখন 'নাট্য বেদোৎপত্তি' কাহিনী প্রসঙ্গে মুখ্য শ্লোক—

এবং সংকল্প্য ভগবান্ সর্ববেদাননস্মরণ্।

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥ ১ অঃ।

---

* তবে, এর মধ্যে সাত্বতী ও ভারতী বৃত্তিই প্রধান; কদাচিৎ আরভটী বৃত্তি আবির্ভূত হয়। কৈশিকী বলতে বৃত্তির একান্ত অভাব।

অর্থাৎ—এইরূপ সংকল্প করে ভগবান ব্রহ্মা সর্ববেদ অনুস্মরণ করলেন। পরেই, চতুর্বেদাঙ্গ-সম্ভব নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন।

তিনজন ঈশ্বরের মধ্যে ব্রহ্মা অন্যতম। সুতরাং সংকল্প মাত্র নাট্যবেদ সৃষ্টি হল, এমন কিছু অভিনব আশ্চর্যের কথা নয়। অতঃপর,

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানথর্ববণাদপি ॥১৭॥

অর্থাৎ—ব্রহ্মা ঋগ্‌বেদ থেকে পাঠ্য (নাট্যোপযোগী পাঠ্য) সামসকল থেকে গীত (নাট্যো-পযোগী গীত) যজুর্বেদ থেকে অভিনয় সকল (নাট্যোপযোগী অভিনয় সকল) এবং অথর্ববেদ থেকে রস সকল (নাট্যরস সকল) উৎকর্ষণ করলেন।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে নাট্যোপযোগী পাঠ্য আছে কিনা, সামসকলের মধ্যে নাট্যোপযোগী গীত আছে কিনা, যজুর্বেদের মধ্যে নাট্যোপযোগী অভিনয় আছে কিনা, অথবা অথর্ববেদের মধ্যে নাট্যো-পযোগী রস সকলের বস্তু-গত প্রসঙ্গ আছে কিনা, এ সমস্ত তর্ক সম্প্রতি পরীক্ষণীয় নয়।

প্রশ্ন এই, ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট নাট্য বেদের মধ্যে বাদ্য ও নৃত্ত নেই। তাহলে নাট্যের অনুষ্ঠানে নৃত্ত ও বাদ্যের প্রয়োগ বিষয়ে, অপর কোন্ বেদ বা শ্রুতি বা আগম প্রমাণ হবে?

এর মীমাংসার্থে বলা যায়, গান্ধর্বই গীত বাদ্য নৃত্তের মূল প্রমাণ। চতুর্বেদ অনুশীলন করে কেউ কোনও কালে গীত বাদ্য নৃত্তে পটু হয়েছিলেন বা খ্যাতি লাভ করেছিলেন প্রমাণ নেই। গন্ধর্ব-অপ্সরস-কিন্নরবর্গ কেউ কোনও কালে বেদানুশীলন করেছিলেন, এ বিষয়েও প্রমাণ নেই।

বিশেষ এই যে নাট্যশাস্ত্রের ৪ অধ্যায়ে (২৪৬ শ্লোক থেকে ২৫৭ শ্লোক স্তর) হর-পার্ব-তীর নৃত্তের বিষয়ে আখ্যান ও পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তের প্রসঙ্গ আছে। এই পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত ১৮ প্রকার ও আঠারটি দেব-দেবতা গণের দ্বারা কৃত হয়েছিল। তার মধ্যে "পদ্মপিণ্ডী স্বয়ম্ভুবঃ" বাক্যের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে ব্রহ্মা স্বয়ং পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তে যোগদান করেছিলেন। যে ব্রহ্মা স্বয়ং পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত করলেন, এবং তার সঙ্গে বাদ্যও ছিল, সেই ব্রহ্মা নাট্যবেদ রচনারকালে নৃত্ত-বাদ্যের উপযোগিতা অবহেলা করলেন, এ রকম বিরুদ্ধ ঐতিহ্য পাঠককে বিভ্রান্ত করতে বাধ্য।

সুতরাং—সিদ্ধান্ত এই হয় যে—নাট্যবেদ-সমুদ্ধার কাহিনী আদ্যোপান্ত কলপনামূলক। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ একথা জেনেও এই কাহিনীকে নাট্যশাস্ত্রে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরা এই কাহিনী রচনা করেননি। **কাহিনীটি কাঁচা বুদ্ধির পরিচয় দেয়।** তবে, এমনও হতে পারে সংগ্রহ-শাস্ত্রের সমাগামিয়ক কালে অপর কোনও সম্প্রদায়ের বা সংসদের মধ্যে এই নাট্যবেদ কাহিনী প্রচলিত ছিল। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গের আবির্ভাবের পূর্বেই ঐ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কাহিনী সংগ্রহ-শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রক্ষেপরূপে প্রবেশ লাভ করেছিল। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ যখন নাট্য-শাস্ত্র বিরচিত করেছিলেন, তখন এই অনাহূত স্বসমাগত অতিথিকে বিদায় জ্ঞাপন করেননি।

একটি সমীচীন প্রশ্ন

বিজ্ঞাপনীয় বিষয়গুলিকে তদাকারে ও সরল বিজ্ঞানোপদেশ রূপে ছায়াভূমিক অংশে অধ্যায় ক্রমে বিনিবেশিত করলেইত শাস্ত্রোদ্ধার বা শাস্ত্ররচনার কার্যোদ্ধার হয়। তা না করে, মাধ্যমিক সম্পা-দকবর্গ সংগ্রহ-শাস্ত্রের শিল্পবিজ্ঞানরূপবত্তা জেনেও কি হেতু নাট্যশাস্ত্র বিরচন কালে অলৌকিক প্রসঙ্গ জড়িত কথা-কাহিনী সংলাপ বস্তু শাস্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছিলেন? মোক্ষশাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র ও উপাসনামূলক ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে অলৌকিক সংলাপ দ্বারা উপক্রমণিকা বা অলৌকিক অনুবাদ দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় পাঠকের ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু সংগ্রহশাস্ত্র ত' মোক্ষাদি

বিষয়ক শাস্ত্র নয়। কি এমন প্রয়োজন হয়েছিল যে শিল্পবিজ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যেও অলৌকিক কথা সংলাপ যোজনা করা নিতান্ত আবশ্যক মনে হয়েছিল ?

মীমাংসা

নাট্যশাস্ত্র নামে মাধ্যমিক সম্পাদনার পূর্ব থেকেই মূল সংগ্রহ শাস্ত্রের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রয়োগ -বিধিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নাট্য-গান্ধর্ব সমৃদ্ধি বিষয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। ৩৬ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রসঙ্গ এ বিষয়ে প্রমাণ। বাহুল্য ভয়ে প্রমাণান্তর সকল উল্লেখ করলাম না।

নাট্যই সমাজ জীবনের প্রত্যক্ষ সহজগ্রাহ্য উজ্জ্বলতম আদর্শ (আয়না অর্থে)। সমাজে উচ্ছৃংখলতা ও উন্মার্গপ্রবণতা (১ম অঃ "গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্তে তু কামলোভবশং গতে" ৯ শ্লোক) অনিবার্য ভাবে নাট্য-গান্ধর্ব প্রয়োগকারী শিল্পিবর্গকে প্রভাবিত করে। সমাজ ব্যবহার হবে স্বৈরাচার পরায়ণ অথচ নাট্য শিল্পীরা হবেন ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের মতে সংযমাবতার এ রকম সম্প্রদায়-সিদ্ধি অসম্ভব।

মাধ্যমিক সম্পাদনার পূর্ব থেকেই নাট্য- গান্ধর্ব ব্যাপারের সঙ্গে গ্লানিসূচক বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অপবাদ মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। অনুমান হয়, সেই সময় থেকে সমাজের জ্ঞানী শিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংগ্রহ-শাস্ত্রের প্রতি বীতরাগ হয়েছিলেন। কারণ, নাট্য-গান্ধর্বের সূত্রধার ব্যক্তির পক্ষে যেমন একদিকে গণিকাউদ্ভটাদি প্রকৃতিবর্গকে (৩৪ অঃ; ৩৫ অঃ ৬০ শ্লোক থেকে ৬৫ শ্লোক) আহরণপূর্বক নির্বাচিত ও শিক্ষিত করার প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে সমাজ-ধর্মের পালনপূর্বক শিষ্টতা রক্ষা করারও প্রয়োজন ছিল (৩৬ অঃ, ৬৩ শ্লোকের উত্তরার্ধ)। ঐ সময়ের মধ্যেই সার্থকনামা, পুণ্যাভিধান, সূত্রধার অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছেন। জ্ঞানী ও শিষ্ট ব্যক্তিরা দেখলেন প্রত্যেক নাট্যপ্রয়োগী বা নট ব্যক্তিরা নিজেদেরকে "ভরত" নামে অভিহিত করছেন। **কাব্য-সাহিত্য**কারের গোষ্ঠীও উক্ত ভরতাভিমানী নটদের সুরে সুরে মিলাতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ—কাব্য-সাহিত্যকার এবং কোষকারদের ধারণায় 'ভরত' ও 'নট' শব্দ একার্থবাচক হয়ে পড়েছে। নাট্য-গান্ধর্বের শিক্ষা-শিক্ষণ ব্যপদেশে বৈশিক-শাস্ত্রই (বেশ-প্রসাধন ও বেশ্যাভিজ্ঞান শাস্ত্র) প্রামাণিক রূপে গ্রাহ্য হতে আরম্ভ করেছে। গান্ধর্বের বিশিষ্ট ধারণা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। শূণ্য স্থানে আবির্ভূত হয়েছে "তৌর্যত্রিক"*। গীত, বাদ্য ও নৃত্ত পুনর্মূষিকত্ব প্রাপ্ত হয়ে স্বস্থানে* প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। নাট্যাদর্শ লুপ্ত হয়েছে; তার স্থান অধিকার করেছে "নাটকাখ্যায়িকা-দর্শনম্" উল্লিখিত। (বাৎস্যায়ণ কামসূত্রম্ সাধারণমধিকরণম) এই "নাটকাখ্যায়িকা-দর্শনও" চৌষট্টিকলার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, সমাজের শিষ্ট, হিতাহিতবোধসম্পন্ন, শাস্ত্রানুশীলক জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংগ্রহ-শাস্ত্রেও

---

* রাজানুগ্রহে পালিত 'তূর্য' শ্রেণীর তিন প্রকার বাদনীয় যন্ত্রের বেতনভুক ধারক-পোষক ইতি 'তৌরিক' (৩৫ অঃ ৭২ শ্লোক)। তূর্যত্রয় বাদনকারীদের সংশিলষ্ট ইতি 'তৌর্যত্রিক'।

* স্বস্থান অর্থাৎ চৌষট্টি কলার পুরোভাগে; যে চৌষট্টি কলার মধ্যে মোরগ-তিতিরের লড়াইও স্থান পেয়েছিল ভরতের পূর্বকাল থেকে। নাট্যশাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে সূত্রধার আচার্য প্রমুখ পঞ্চ-প্রয়োগিবর্গের কোন পুরুষ "চতুষষ্টিকলাভিজ্ঞ" হতে হবে বলা হয়নি। কিন্তু—নর্তকী-সাধারণ পক্ষে "চতুঃষষ্টিকলান্বিত" হওয়ার উল্লেখ আছে (৩৪ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক)। বাৎস্যায়নের "কামশাস্ত্র" রচনার কালে গান্ধর্ব লুপ্ত; চৌষট্টিকলাই হয়েছে সংস্কৃতিমান নাগরিকদের সাধনার লক্ষ্য।

* "কামশাস্ত্রম্" রচনার কালেও "গান্ধর্ব" কিন্তু কেবল প্রণয়পূর্বক পরিণয় ব্যাপারকে শ্রেণীভুক্ত করার সুবিধার নিমিত্ত!

ব্যবহারিক নাট্য-গান্ধর্বে বীত-রাগ হয়ে পড়বেন, এ আর এমন কি আশ্চর্য কথা!

অন্য কারণও ছিল। বেদাচারী, বৈদিকদৃষ্টি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজ কোনও কালেই নাট্য বা গান্ধর্বকে সমাদর-দৃষ্টিতে আপ্যায়িত করেননি। সংগ্রহ-শাস্ত্র মূলে বেদ বা ত্রয়ী বা চতুর্বেদের দীক্ষা-শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, অপেক্ষিতও ছিল না। যে ব্যাপার বেদানুগ নয়, যার আম্নায়-সিদ্ধি নেই, সেই ব্যাপার বা শাস্ত্র যতই লোকানুগৃহীত বা জনচিত্ততোষক হক, বেদাচারী বিম্বজ্জন তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। *

পুনশ্চ, তৃতীয় একটি কারণও ছিল। সংগ্রহ-শাস্ত্রে 'নৃপতি' ও 'রাজা' বা তদ্বাচক শব্দের বহু উল্লেখ আছে। কিন্তু, এমনও উল্লেখ আছে যদ্দ্বারা রাজপদের প্রতি আবহমান সম্মানের হানি সূচিত হয়। ভারতে সুপ্রাচীন কাল থেকে রাজার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনসম্মত ভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। **'রাজা' ইতি ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ পক্ষে হেতু এই যে,** প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় ভাগ্য যোগ্যতা এবং কর্মশক্তি এই তিনের অধীন। একমাত্র রাজাই কেবল ভাগ্যের অধীন; অপর দু'এর অধীন নয়। যে ব্যক্তি একের (অর্থাৎ পূর্বজন্মাচরিত যজ্ঞাদিকর্ম প্রসূত অদৃষ্টের) অধীন, সে ব্যক্তি অবশ্যই তিনের অধীন ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ। এবং অনুসিদ্ধান্ত এই ছিল যে রাজা মাত্রই দেবাংশে জাত। কিন্তু, যেকালে সংগ্রহ-শাস্ত্র উপদিষ্ট হয়েছিল, সেকালে নাট্য-গান্ধর্ব গোষ্ঠীতে (ভারতীয় গোষ্ঠীতে) উক্ত ধারণার বিরুদ্ধে মত গ্রাহ্য হয়েছিল। যথা ১৩ অধ্যায়ে, গতি-লয় ও গতি-প্রচারের প্রসঙ্গে "রাজাদের দেব-গতি" উপদিষ্ট হওয়ার পরেই প্রশ্ন হয়েছে —

যদা মনুষ্যা রাজান স্তেষাং দেবগতি কথম্ ?
অত্রোচ্যতে কথং নৈষা গতি রাজ্ঞাং ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

অর্থ। রাজাগণ যদি মনুষ্যই হন, তাহলে তাঁদের দেবগতি হবে, এরূপ বলার হেতু কি? এর উত্তরে বলা হচ্ছে কি হেতু উক্ত (দেবগতি) রাজাদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্নকর্তা ও উত্তর দাতা উভয়ই রাজাগণের মনুষ্যত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু—উত্তরদাতা হেতুপ্রয়োগার্থে বলছেন যে—মনুষ্য-রাজাগণের গতি কি হেতু দেবগতি নয়, তার কারণ বলছি। প্রকারান্তরে বলা হল—মনুষ্য-রাজা ব্যতীত অপর রাজাও ত' থাকতে পারে; যথা দেবরাজ ইন্দ্র।

কারণটি বলা হয়েছে, যথা — ইহ প্রকৃতয়ো দিব্যা তথা চ দিব্যমানুষী
মানুষী চেতি বিজ্ঞেয়া নাট্যনৃত্তক্রিয়াং প্রতি ॥ ২৬ ॥

অর্থ। (নাটকাশ্রিত নাট্যের প্রয়োগে) অভিনয় ও নৃত্ত কার্যের প্রয়োগবিষয়ে জানা উচিত যে (ভূমিকাগত) প্রকৃতি সকল দিব্যা, দিব্য মানুষী ও মানুষী।

তাৎপর্য। অভিনয় ও নৃত্ত কার্যের প্রসঙ্গের হেতু এই যে যাবতীয় নাট্যধর্মাশ্রিত অভিনয় ও নৃত্ত কর্ম চারী প্রয়োগের অধীন (১১ অঃ ৫ শ্লোক, "চারিভিঃ প্রস্তুতং নৃত্তং চারিভিশ্চেষ্টিতং তথা" ইত্যাদি, পুনঃ, ৬ শ্লোক "নহি চর্যো বিনা কিঞ্চিন্নাট্যে হ্যঙ্গং প্রবর্ততে")। অতঃপর, দিব্য প্রকৃতিসম্পন্ন রাজা (যথা দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মাপুত্র মনু-আদি রাজগণ), দিব্যমানুষী রাজা (যথা নহুষ, যিনি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন) এবং মানুষী রাজা (মর্ত্যলোকের নৃপতি)।

---

*পরবর্তীকালে বেদদৃষ্টি পণ্ডিতগণ গান্ধর্বকে আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করে যথেষ্ট অনুগৃহীত করেছিলেন, স্বীকার করতে হবে। কিন্তু, যদি অর্থসাধন হয়। তাৎপর্য এই যে, গান্ধর্ব কদাচ ধর্মসাধন হতে পারে না। একমাত্র চতুর্বেদই ধর্মসাধন। অর্থসাধন গান্ধর্বকে অনুগৃহীত করা যেতে পারে। কিন্তু কামসাধন গান্ধর্ব বেদ বা বিদ্যানামেরই যোগ্য নয়। অবশ্যই স্বীকার্য যে উক্ত বেদবিদ্ জ্ঞানী জনেরা গান্ধর্বের অত্যর্থসাধকত্ব, এবং ধর্মার্থকামমোক্ষনিরপেক্ষ আনন্দদায়কত্ব গ্রাহ্যই করতেন না। !

প্রশ্নের উত্তর পক্ষে সূচিত হল যে, মানুষ রাজার গতি কখনই দেবগতি হবে না। অপর দু'রকমের রাজার পক্ষে দেবগতি বিধেয়। এই হ'ল সাধারণ বিধি। অতঃপর, ২৮ শ্লোকে একটি বিশেষ বিধি উপদিষ্ট যথা— দেবাংশজাস্তু রাজানো বেদাধ্যাত্ম প্রকীর্তিতাং।

এবং দেবানুকরণে দোষো হ্যত্রন বিদ্যতে ॥ ২৮ ॥

অর্থ। কিন্তু, বেদ (শাস্ত্র) ও অধ্যাত্ম (অনুমানাদি প্রমাণ) সম্বলিত রূপে যে সকল রাজা দেবাংশজাত গণ্য হয়েছেন (পুরাণাদিঐতিহ্যে) তাঁদের (নাট্য-নৃত্তগত গতিচারী) দেবগতির অনুকরণ হলে দোষ নেই।

তাৎপর্য। বেদাংশজাত রাজা মাত্র পুরাণাদিতে খ্যাত। পুরাণের শাস্ত্রখ্যাতি আছে, বেদখ্যাতিও ছিল (যথা পুরাণবিদ্যা-বেদ)। অধিকন্তু—পুরাণের মধ্যে ন্যায়-প্রয়োগ প্রবর্তনাও দৃষ্ট হয়। নতুবা, মর্ত্য লোকের সাধারণ ঐতিহ্যগত যাবতীয় রাজা মনুষ্য মাত্র।

সার কথা, ভরত মুনি এবং সমাগত মুনিরা মরলোকের লৌকিক রাজার দেবত্ব, দিব্য মানুষিত্ব, বা দেবাংশজাতত্ব স্বীকার করতেন না। যাই হক, বিশিষ্ট রাজবর্গ প্রচার করতেন যে তাঁরা দেবাংশসম্ভূত, যথা চন্দ্রবংশীয় ও সূর্যবংশীয় রাজগণ।

অন্য একটি উক্তি দিয়ে রাজসাধারণ্য ব্যংগ-বক্রোক্তির বিষয় হয়েছে, যথা—৩৫ অঃ ৪২ শ্লোকে রাজবদ্ ভবত স্তস্মনাৎ রাজাঽপি নটবদ্ ভবেৎ।

যথা নটস্তথা রাজা যথা রাজা তথা নটঃ ॥ ৪২ ॥ ৩৫ অঃ।

'তস্মাৎ' অর্থাৎ—অব্যবহিত পূর্বে হেতুযুক্তিপূর্বক উপদিষ্ট হয়েছে, যে, সামান্য নাট্যোপজীবী নটকে উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা ও বেশভূষানুকরণ দ্বারা রাজভূমিকার যোগ্য করা যায়।

শ্লোকার্থ। ভরত (ইতি সার্থকনামা নাট্যগান্ধর্ব প্রয়োগবিচক্ষণ পুরুষ) রাজবৎ (নাট্য গান্ধর্ব সংসদে রাজসদৃশ) মান্য। (সেই সংসদে স্বয়ং রাজা উপস্থিত হলেও) সেই রাজা (মাত্র পদবী-বেশ-ভূষাদির কারণে) সামান্য নটবৎ গণ্য হন (নতু ভরতবৎ)। মাত্র বেশভূষাদিযুক্ত হওয়ার কারণে) নট যেমন রাজা প্রতিপন্ন হন সেরূপ রাজাও (মাত্র বেশভূষাদিকারণে) নট অর্থাৎ রাজসজ্জিত ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হন।

ব্যংগ এই যে—সমাজে যে ব্যক্তি হীনকুলোদ্ভব, নাট্যোপজীবী নট মাত্র, সেও রাজভূমিকায় শ্রেষ্ঠ রাজার ন্যায় দর্শকের হৃদয়ে প্রতিপন্ন হন। এবং—সমাজে যিনি উচ্চকুলোদ্ভব রাজা তিনিও ভাগ্যচক্রে সামান্য নটের মতো দেশ-দেশান্তরে জীবিকার সন্ধানে পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং—মনুষ্যত্ব পক্ষে নট ও রাজা সমান। কিন্তু—'ভরত' উপাধি নাট্য-গান্ধর্বে বিদগ্ধতার পরিচয় দেয়। রাজবৎ বংশ-পরিচয়, অথবা, নটবৎ সামান্য নাট্যকর্মশীলতার পরিচয় দ্বারা কোনও মনুষ্য 'ভরত' গণ্য হয় না।

বলাই বাহুল্য সংগ্রহ-শাস্ত্রের এরকম প্রসংগ রাজবর্গের পক্ষে কর্ণামৃতরসায়ণ নয়। কিন্তু—ছায়াভূমিক অংশে রাজা এমনকি, তৎসমভিব্যাহারপরায়ণা নর্তকীরাও * বহু মানিত হয়েছেন। সংগ্রহ-শাস্ত্রের ঝাড়-বাছা কথার তীক্ষ্ণাগ্রতা ছায়াভূমিক অধ্যায়ের মধ্যে অনেকখানি মোলায়েম করা হয়েছে।

মূলপ্রশ্নে ফিরে যাওয়া যাক। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ সংগ্রহ-শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপির, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও ব্যবহারিক নাট্য-গান্ধর্বের দুর্গতির গুণ-পরিমান বুঝতে পেরেছিলেন। দুর্গতির কারণও বুঝেছিলেন।

---

* ৩ অধ্যায়ে ৮৫ শ্লোক থেকে ৮৮ শ্লোক স্তরে নৃপ ও নর্তকীগণের প্রতি অভিনন্দন বাণী দ্রষ্টব্য।

তাঁরা প্রতিকারের উপায় চিন্তা করেছিলেন। উপায় আবিষ্কারও করেছিলেন। তদানীন্তন যুগোপযোগী সেই উপায়কে প্রশংসা না করে থাকতে পারিনে।

প্রথম, সংগ্রহ-শাস্ত্র নাম পরিবর্তন করে "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র" ইতি অভিনব নামকরণ। দ্বিতীয়, সেকালে লভ্য পাণ্ডুলিপির ছিন্ন-ভিন্ন-বিকীর্ণ বস্তু-রূপগুলি নিয়ে যথেষ্ট বুদ্ধি ও শ্রম সহকারে অধ্যায়-বিভাগ বিকল্পন করা। তৃতীয় সর্বপ্রথম অধ্যায়ে নাট্যবেদ-সৃষ্টি কাহিনী বিন্যাস এবং শ্রুতিগত ঐতিহ্য ও কাহিনী সম্বলিত সংলাপ বর্ণনা করা। চতুর্থ সংগ্রহ-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষার্থে, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ বিভাগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অংশগুলির বিন্যাস করা। এবং সর্বশেষ ৩৬ অধ্যায়ে পুনরায় কিছু শ্রৌতবার্তা ও কাহিনী বিন্যাস করা।

প্রসংগত, যে কালে এই "নাট্যশাস্ত্র" নামকরণ ঘটেছিল, সে কালপর্যন্ত গুরুগ্রন্থের নামের পূর্বে শ্রী-শব্দ যোজিত করার রীতি প্রবর্তিত হয়নি। এবং—সংগ্রহ-শাস্ত্রের মধ্যে "উপবেদ" শব্দের অনুল্লেখ, তথা ১ অধ্যায়ে বেদোপবেদৈশ্চ (১ অঃ ১৮ শ্লোক) শব্দের উল্লেখ দ্বারা অনুমান হয়, নাট্যশাস্ত্র নামকরণের পূর্বেই উপবেদ-কল্পনা (আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ব-বেদ, ও স্থাপত্যবেদ) উদ্ভাবিত হয়েছিল। সংগ্রহশাস্ত্রের মধ্যে গন্ধর্ব-বেদ শব্দ নেই, অথচ গান্ধর্ব আছে, গান্ধর্বের ঐতিহ্য আছে।

নাট্যবেদ-উৎপত্তি কাহিনী

১ম অধ্যায় ৭ শ্লোকে "ব্রহ্মানির্মিতঃ নাট্যবেদস্য সম্ভবঃ" বলা হয়েছে। কাহিনীটি পাঠ করলে সিদ্ধান্ত এই হয় যে, ব্যাপারটি মূলে বেদ থেকে 'মানস-সংগ্রহ' মাত্র। কিন্তু—সংগ্রহ-বেদ বা বেদ-সংগ্রহ বললে অভীপ্সিত ফল লাভ হয় না। যাই হক, ১ অধ্যায় ৯ শ্লোক থেকে বিবৃতির সরল বঙ্গানুবাদ করব।

"হে বিপ্রগণ! পূর্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সত্য যুগ গত হলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়ে লোক সকল সুখিত-দুঃখিত চিত্তে কামলোভ পরবশ, গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্ত এবং ঈর্ষা-ক্রোধ দ্বারা অভিসংমূঢ় হয়ে কালাতিপাত করেছিল।

"অন্যদিকে, লোকপাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জম্বু দ্বীপে (ভারত ভূমি) যখন দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষো-রক্ষঃ ও মহাসর্প সকল পরিক্রমণ করছিলেন তখন মহেন্দ্র-প্রমুখ দেবতাগণ পিতামহ ব্রহ্মকে বলেছিলেন "আমরা শ্রব্য-দৃশ্য রূপ ক্রীড়নীয়ক (খেলা-তামাসার জিনিষ) লাভ করতে ইচ্ছা করি। (অপি চ) শূদ্রজাতিকে ত' বেদব্যবহার শ্রাবিত করা যায় না। অতএব, আপনি অভিনব সর্ববর্ণগ্রাহ্য এক বেদ সৃষ্টি করুন।

"দেবরাজ ও অন্যসকলকে 'এবমস্তু' (তাই হ'ক) উত্তর দান করে এবং তাদিগকে ত্যাগ করে, সেই তত্ত্ববিদ্ ব্রহ্ম যোগ অবলম্বন পুরঃসর চতুর্বেদ স্মরণ করলেন। (অতঃপর) তিনি সংকল্প করেছিলেন যথা, 'ধর্ম অর্থ ও যশস্য বিষয়গুলি উপদেশাকারিত করে ও সংগ্রহ-সহকৃত করে, ভবিষ্যৎ লোকেরা স্বার্থসাধক সর্বকর্মের অনুদর্শক, সর্বশাস্ত্রার্থ যুক্ত, সর্বশিল্পপ্রদর্শক এই নাট্যসংজ্ঞক বেদ ইতিহাস-সহকারে নির্মাণ করি।

"সর্ববেদ অনুস্মরণ করে ভগবান ব্রহ্মা তদনন্তর চতুবেদাংগসম্ভব নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন। ঋগ্‌বেদ থেকে পাঠ্য (আবৃত্তি সংলাপ বস্তু) গ্রহণ করলেন। সাম-সকল থেকে গীত (বস্তু, ছন্দঃ) গ্রহণ করলেন। যজুর্বেদ থেকে অভিনয় সকল গ্রহণ করলেন। এবং, অথর্ব-বেদ থেকে রস সকল গ্রহণ করলেন।

"এই রূপে মহাত্মা ব্রহ্মা কর্তৃক বেদ-উপবেদ দ্বারা গ্রথিত, ললিতাত্মক (রমণীয়তা গুণযুক্ত) নাট্যবেদ সৃষ্ট হয়েছিল।"

১ম অধ্যায়ে ভরত মুনির মুখ দিয়ে এই বেদ-সৃষ্টি কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে।

এই কাহিনীর মধ্যে দু'টি আন্তরিক দোষ আছে। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ ইচ্ছা করিলেই এই দোষ দু'টি নিরস্ত করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। তজ্জন্য, এঁ'রা আমাদের ধন্যবাদার্হ। **প্রথম দোষ, বা বর্ণনার অভাব দোষ,** যথা—ব্রহ্মার মনের সংকল্প মরলোকবাসী ভরত জানলেন কি করে; এবং ভরত ব্রহ্মার সম্মুখে কখনই বা উপস্থিত হ'লেন, বলা হয়নি। **দ্বিতীয় দোষ** যে সংকল্পিত নাট্যবেদ সর্বশিল্প-প্রদর্শক, তার মধ্যে বাদ্য-নৃত্ত অনুল্লেখের কারণে সর্বশিল্পাদর্শত্ব সিদ্ধ হয় না। তবে, "সর্বশিল্প-প্রদর্শকম্" স্থলে "সর্বশীলপ্রদর্শকম্" ইতি পাঠান্তর আছে। তাহ'লে, দ্বিতীয় সংশয়টি নিরস্ত হয়। তা'লেও "সর্বকর্মানুদর্শকম্" নাট্যবেদে কি হেতু বাদ্যকর্ম ও নৃত্ত কর্ম গৃহীত হয়নি, তার কোন মীমাংসা হয় না।

প্রসঙ্গত, এই কাহিনীটি যখন রচিত হয়েছিল, তখন বেদের অতিরিক্ত "উপবেদ" নামে পর্যায়-বিশেষ বেদানুবর্তী জ্ঞানী সমাজে প্রবর্তিত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপবেদ অর্থাৎ আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ। স্বতঃই মনে হয় ব্রহ্মা কর্তৃক নাট্যবেদ সৃষ্ট হওয়ার পূর্বেই গন্ধর্ব-বেদ ছিল; নিশ্চয়। নাট্যশাস্ত্রে 'গন্ধর্ব-বেদ' নামে কোনও বস্তুর উল্লেখ নেই। এও এক সমস্যা। ভরত মুনির মুখে "গান্ধর্ব" ও "গান্ধর্ব-সংগ্রহ" উপদিষ্ট কুত্রাপি গন্ধর্ব-বেদ বা গান্ধর্ব-বেদ প্রসঙ্গ নেই।

"সঙ্গীত-রত্নাকর" গ্রন্থের প্রণেতা বহুল ভাবে ভরত-বচন ও নাট্যশাস্ত্রের অনুবাদ ও অনুসরণ করেছেন। কিন্তু, মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি, উক্ত স্বনামধন্য গ্রন্থকার বহুস্থলে "অর্ধকুক্কুটীয় ন্যায়"* অনুসরণ করে নিজ সিদ্ধান্তের স্বার্থে ভরত-কথিত বিবৃতির কিছু গ্রহণ করেছেন কিছু বর্জন করেছেন। যথা—৭ম নর্তনাধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে শার্ঙ্গদেব "নাট্যবেদোৎপত্তি" কাহিনী অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু—ঐ শ্লোকেই বলেছেন—ভরত গন্ধর্বাপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবের সম্মুখে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত প্রয়োগ করেছিলেন। বস্তুত, নাট্যশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে এ রূপ কোনও কাহিনী বা বিবৃতি নেই। পুনশ্চ—শার্ঙ্গদেব বলেছেন তণ্ডু তাণ্ডব-নৃত্ত শিক্ষা-প্রচারিত করেছিলেন। এ কথা নাট্যশাস্ত্রে আছে। আবার বলেছেন, উমা বা পার্বতী মর্ত্যলোকে লাস্য-নৃত্য প্রচার করেছিলেন। এরকম ঐতিহ্য নাট্যশাস্ত্রে নেই। অবশ্য, শার্ঙ্গদেব অন্য কোনও ঐতিহ্য উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু—সেই ঐতিহ্যের প্রমাণ উল্লেখ করেননি। অধিকন্তু—সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার "চতুর কল্লিনাথ" নাট্যবেদ-ঐতিহ্যের টীকা প্রসঙ্গে একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন যথা "সামবেদস্যোপবেদো গান্ধর্ববেদঃ"। বচনটির বক্তা কে তাও বলেননি। এবং—মূল গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেব প্রবন্ধাধ্যায়ে 'গান্ধর্ব' সংজ্ঞা-লক্ষণ পক্ষে বলেছেন "গান্ধর্ব অনাদিসম্প্রদায়"। সেস্থলে কল্লিনাথ টীকা করেছেন "গান্ধর্ব বেদবদ্ অপৌরুষেয়"। শার্ঙ্গদেব যাকে "অনাদিসম্প্রদায়" বলেছেন, সেই "অনাদিসম্প্রদায়" অর্থে অপৌরুষেয়ত্বের আরোপ করা যুক্তিহীন। ঐ দু'টি শব্দত একার্থবাচক নয়।

যাই হ'ক, "নাট্যবেদ-সৃষ্টি" কাহিনী একেবারেই কল্পিত। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ এই কাহিনী রচনা করেননি। কিন্তু নাট্যপ্রয়োগ 'নাট্যবেদ' নামক বেদের অবলম্বিত, এরকম ধারণা প্রচলিত ছিল, কাহিনীও প্রচলিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভে এই কাহিনীটি প্রক্ষেপ করলে বিদ্বান সমাজে নাট্যশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, এই সহজ বিশ্বাসের বশে উক্ত সম্পাদকবর্গ কাহিনীটি

---

* মুরগীর যে অংশটি ডিম্ব প্রসব করে, তাকে রক্ষা করে, অবশিষ্ট অংশটি কেটে ফেলার মনোভাবকে "অর্ধকুক্কুটীয় ন্যায়" বলে।

যোজিত করেছিলেন। প্রাচীন কাল থেকে বেদানুবর্তী জ্ঞানিবর্গের হৃদয়ে 'বেদ' শব্দটি এমনই মাহাত্ম্য সৃষ্টি করেছিল যে "বেদ-বাক্য" অর্থে অভ্রান্ত সন্দেহাতীত বাক্য মনে করা হ'ত। বেদবাক্যের প্রামাণ্য বিষয়ে কেউ তর্ক-সন্দেহ করলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি পাষণ্ড বা নাস্তিক গণ্য হ'ত। সুতরাং "ব্রহ্মা নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন" এবং "ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন" এই দু'টি উক্তির মধ্যে পূর্ব উক্তিই বিশিষ্ট ভাবে নাট্যের মর্যাদাকারক।

অতিক্ষুদ্র অনুশীলক আমি আজ মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গের চিরস্মরণীয় প্রযত্নের ছল, ত্রুটি ও দোষ আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছি। তাইতে, একটি অসম্ভব কল্পনা করে বলতে ইচ্ছা করে, আজ যদি মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গের কোনও প্রেতপুরুষ অকস্মাৎ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হন, তাহলে সর্বাগ্রে আমি তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে পরে বলব—আপনারা সত্য সত্যই মহীয়ান ও অশেষ ধন্যবাদার্হ। নাট্য-গান্ধর্ব মহাদ্রুমের ছায়াতলে নিবিষ্ট মনে বসে আপনারা 'নাট্যশাস্ত্র' নামে নবীন আধারে অতুলনীয় এক মধুপর্ক রচনা করেছিলেন। সংগ্রহ-চক্রোথ মধু, স্নেহজাতীয় সংলাপ, নীতিবচন-রূপ দধি ও অলৌকিক প্রসঙ্গ-রূপ শর্করাখণ্ড একত্রে মিশ্রিত করে, তথা কারিকা কুসুম-নির্ঝর পবিত্র শিশির-বিন্দুর প্রক্ষেপ দিয়ে, অপূর্ব এই নাট্যশাস্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন! ভাগ্য যে করেছিলেন! নচেৎ আমার মতো অকিঞ্চন শাস্ত্রভয়-ভীত বিদ্যার্থী এর স্বাদ মাত্রও গ্রহণ করত না। আপনারা হয়ত জানেন না, সম্প্রতি ধরাধামে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পণ্ডিতবর্গ আপনাদের প্রতি কটাক্ষ করে "রি-হ্যাণ্ড্‌লিং"এর অপবাদ করেছেন। হয়ত খবরই রাখেন না, যে আধুনিক ভারতে পাশ্চাত্য বেদবাক্যের অনুবাদনধ্বনি পত্রতন্ত্রাবনদ্ধ অক্ষরের মাধ্যমে মুখরিত হয়ে উঠছে। তবে, এ কথাও সত্য যে আপনারা পণ্ডিতের মুখোচ্ছিষ্ট অপবাদ আর সূর্যের লালায়িত প্রশস্তিবাচন এই উভয়েরই উর্দ্ধে আছেন। আপনাদের কীই বা উপহার করি, কী দিয়েই বা তুষ্ট করি! তথাপি, এই গান্ধর্বলুব্ধ ব্যক্তিটি অনেক কষ্টে একটি শ্লোক রচনা করেছিল; সেইটেই শুনিয়ে দেই—

শম্ভো নির্ত্যং হৃদয়রমণং সিদ্ধগন্ধর্বজুষ্যম্।
যন্ত্রৈর্বেদ্যং সরসমধুরং সম্ভৃতং দেবতাভিঃ॥
হৃদ্যং স্নিগ্ধং যদপি ভরতে নিশ্চিতং শাস্ত্রবুদ্ধ্যা।
শ্রেয়ঃকল্পং ভবতু সুখদং চাপি নিঃশ্রেয়সে তৎ॥

নিঃশ্রেয়স কুসুমের সৌরভে প্রলুব্ধ এই অর্বাচীন পতঙ্গ নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দিকে দিগ্‌ভ্রান্ত মন্দ গতিতে পরিক্রমা করেছিল। তারই ফলে, আপনাদের সন্ধান পেয়েছিলাম। আপনারা যে সমস্ত সুপ্রাচীন ভরত-যতিবৃন্দের শব্দপদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদেরই উদ্দেশ্যে মতঙ্গ মুনি বলেছিলেন—

ভং জ্যোতি স্তদ্ রতো হংসস্তস্মাত্তং ভরতং বিদুঃ।
তদ্‌ভবং ভরতজ্ঞানং তদ্‌ভবা ভারতী শুভা॥ *

আপনাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র" আপনাদের অভিনব বিরচনার উত্তম ফল।

---

* বৃহদ্দেশী, ২৭৭ শ্লোক।

অতিমানববাদ ও ফ্রেডারিক নীৎসে

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

দূর পর্বতকন্দরের নিভৃত তপস্যা ছেড়ে জারাথুস্ত্রা জনতার মাঝখানে এসে তার সাধনালব্ধ বাণী প্রচার করতে লাগল ঃ বিপদকে আলিংগন করে বেঁচে থাক, আগ্নেয়গিরির চারপাশে নগর গড়ে তোল; দূর অজানা সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে দাও। সমস্ত দেবতা মরে গেছে। কেবলমাত্র আমরাই অতিমানব হয়ে বেঁচে থাকব। নূতন সৃষ্টির জন্য যা কিছু পুরোন ও প্রথাবদ্ধ সব ভেংগে ফেল। আমি ভালবাসি একমাত্র তাকেই যে কিছু না কিছু সৃষ্টি করে পরে নিজে ধ্বংস হয়ে যায়।

এমনি করে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র জারাথুস্ত্রার মুখ দিয়ে তাঁর মনের অনেক কথাই বলে গেছেন নীৎসে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে নীৎসের স্থান কোথায়, তিনি যা বলে গেছেন, তার মূল্য কতখানি তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য না হলেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, এক বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁর আবির্ভাবের। যুগ যুগান্তব্যাপী প্রচলিত ন্যায় ও নীতিবোধের এক বিরাট অচলায়তন ও যে কোন পরিবর্তনের পরিপন্থী বিভিন্ন রকমের প্রথাগত ধারণা যখন এক অন্ধ মোহের আবরণে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে, ঠিক তখনি নূতনতর এক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে বিচার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সব কিছু জিনিসের।

যীশুখৃষ্ট যেমন নীতি ও বিশ্বপ্রেমকে অভিন্ন বলে দেখেছিলেন, সক্রেটিস যেমন দেখেছিলেন 'ইন্‌টেলেক্ট' বা প্রজ্ঞা ও নীতিকে এক করে, তেমনি নীৎসে দেখলেন, শক্তি ও নীতি হচ্ছে এক এবং অভিন্ন। এক গূঢ় শক্তি এষণা বা 'উইল টু পাওয়ার' মানুষের সমগ্র মানসভূমি থেকে সমস্ত রকমের নীতি চেতনাকে অপসারিত করে এক অপ্রতিহত প্রতাপের রাজত্ব করছে সেখানে সব সময়ের জন্য। মানুষের সকল প্রবৃত্তির মধ্যে এই শক্তি এষণা হচ্ছে প্রবলতর এবং এই শক্তি এষণার দ্বারাই তার জীবনের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তা, ভাব ও ভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে প্রতিনিয়ত। যেসব মানুষ নিত্য নূতন ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রামসংকুল পথে দুর্বারবেগে এগিয়ে চলে, যারা অপরাজেয় পৌরুষ ও অদম্য প্রাণশক্তির দ্বারা কামনার কুঁড়িগুলিকে একে একে প্রস্ফুটিত করে সফল ও সুন্দর করে গড়ে তোলে জীবনকে, তাদের মধ্যেই এই শক্তি এষণা সবচেয়ে বেশী সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। আর এই সব মানুষদের নীতিকেই নীৎসে অভিহিত করেছেন 'হেরেন মর‍্যালস' বা বীরোচিত নীতি বলে। কিন্তু যারা যতদূর সম্ভব বিপদকে আলগোছে এড়িয়ে অলস শক্তির পথে সলাজ সন্ত্রাসে অতি সাবধানে এগিয়ে চলে, প্রেমধর্মী খৃষ্টীয় নীতিবাদের নরম পলিমাটিতে মন যাদের পুষ্ট, তাদের 'হারডেন মর‍্যালস' বা দুর্বলজনোচিত নীতি বড় হওয়ার পথে এক অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যা কিছু সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি করে তাই ভাল জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'বসি' আর যা কিছু মনে দুর্বলতার সৃষ্টি করে তাই হচ্ছে মন্দ বা 'শিলেক্ট'।

২

যীশু বলেছেন, সমস্ত মানুষকে ভালবাস। শুধু যীশু কেন, সমস্ত ধর্মপ্রবর্তকেরই মুখে ঐ এক কথা, মানুষে মানুষে সব ভেদাভেদ লুপ্ত করে দাও; সব মানুষকে নিজের মত করে ভাল-

বাস। কিন্তু কেন একজন মানুষের পক্ষে কার্যতঃ অন্য একজন মানুষকে নিজের মত করে ভালবাসা সম্ভব নয়—তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে সেগুলিকে অপসারিত করবার কোন চেষ্টাই করে যাননি তাঁরা। কখনো সচেতন মনের উপরিপৃষ্ঠে কখনো অবচেতন মনের অতলান্তিক গভীরে যে বৈষম্যবোধ, যে সব কুৎসিত কামনা বাসনার অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব অহরহ আমরা অনুভব করি থাকি, আত্ম-আরোপিত এক সাম্যভাবের সোনালি প্রলেপ দিয়ে সে অস্তিত্বকে মুছে দেবার এক ব্যর্থ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তাঁদের সমস্ত নীতিউপদেশের মধ্যে।

খৃষ্ট প্রচারিত সাম্য ও মৈত্রীকে ভিত্তি করে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি যেসব রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়ে উঠেছে, সেই সব আদর্শের উদার আশ্রয়ে আর যাই হোক, কোন অতিমানব অথবা অসাধারণ প্রতিভাধর কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটা সম্ভব নয়। কারণ সকল মানুষ সমান এবং সকল মানুষের মূল্য ও মূলগত অধিকার এক—এই ধারণা যখন কোন মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, তখন সংগ্রাম ও সাধনার দ্বারা আর সকলকে ছাড়িয়ে বড় হবার আকাংক্ষা যায় তার একেবারে কমে। সাধারণ মানুষের মনে এই ব্যাপক উদ্যমহীনতা ও আকাশচুম্বী উচ্চাভিলাষের শোচনীয় অভাব কোন রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক অশুভ লক্ষণের পরিচায়ক। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন উচ্চ আদর্শ বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যহীন মানব সমাজের অর্থহীন একটানা জীবনাবর্তনকেই প্রগতিবাদের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে প্রচার করা হচ্ছে। নীৎসে বলেছেন ঃ Such a society loses character; imitation is horizontal instead of vertical—not the superior man but the majority man becomes the ideal and the model", শীর্ষকেন্দ্রিকতা নয় সমতলবর্তিতাই হলো সব অনুকরণের ধর্ম; ফলে অতিমানবের পরিবর্তে সাধারণ মানুষই হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ। এই সমস্ত সমাজে পুরুষেরা তাদের পৌরুষ হারিয়ে নারীসুলভ দুর্বলতায় এতখানি ভেংগে পড়ে যে নারীরা তাদের নারীত্ব হারিয়ে আচারে ব্যবহারে পুরুষালি ভাবের পরিচয় দিতে থাকে।

Here is little of man; therefore women try to make themselves manly. For only he who is enough of man will save the woman in, woman.

শুধু তাই নয় নীৎসের মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব নয়। উভয়ের মধ্যে বিবাদ অপরিহার্য; কারণ একে অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার চালাবেই এবং একমাত্র তখনি উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন সম্ভব যখন একজন অপরের অবিসম্বাদিত প্রভুত্বকে স্বীকার করে নেবে। তাছাড়া নারীরা প্রকৃতপক্ষে সাম্য ও স্বাধীনতা চায়ও না, পুরুষ যদি সত্যিকারের পুরুষ হয়, তবে তার প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে নারীরা তৃপ্তি পায়।

যদিও পৃথিবীর নীতিবাগীশরা জোর করে প্রচার করে থাকেন সকল মানুষ সমান এবং এই প্রচারের ফলে যদিও কোন কোন রাষ্ট্রে বা সমাজে অনেকে অতিমানবতালাভের উন্মার্গগামী আকাংক্ষা ত্যাগ করে সহজ সমতলবর্তী অনুকরণপ্রবণতায় গা ঢেলে দেয়, তবুও একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে সকল মানুষ কখনো সমান হতে পারে না এবং সাম্য তাদের কাম্যও নয়। প্রকৃতিজগৎও সাম্যের অনুকূল নয়। প্রকৃতি সাম্য চায় না; বিভেদ ও বৈচিত্র্যের উপাদানেই প্রাকৃতিক নিয়মের মানদন্ডটি গঠিত। আদিকাল হতে আজপর্যন্ত জীবজগৎ ও মানবজগতের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সে ইতিহাস হচ্ছে ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতিগত বিরোধ ও বিষমতার ইতিহাস। অধিকতর শক্তিশালী জীব বা মানুষ চিরকাল ধরে নির্মম ভাবে শোষণ করে এসেছে দুর্বলদের এবং আজও করছে যেমন বড় বড় মাছগুলো ছোট ছোট মাছেদের ধরে ধরে খায়।

Men are not equal. We wish to possess nothing in common..... The process of evolution involves the utilization of the inferior species, rase, class or individual by the superior; all life is exploitation and subsists ultimately on other life.

এই শোষণ সাধারণতঃ দুরকমের — সমজাতীয় ও বিজাতীয়। কোন জীব যেমন সমজাতীয় কোন দুর্বল জীবকে সুযোগ পেলেই শোষণ করে থাকে তার ক্ষুধার খাদ্য কেড়ে নেয় তেমনি সে বিজাতীয় কোন দুর্বল জীবকেও তার প্রয়োজন মেটাবার অন্তররূপে নির্মমভাবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। জীবজগৎ ও মানবজগতের সকল স্তরেই এই বিরোধ এই বিষমতা বিদ্যমান। কোন জীবই তার নিজের প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট নয়; অপরের দ্বারা অধিকৃত যা কিছু, যা তার নিজের নেই, সেই সব অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতি লোভ ও লালসা তার অপরিসীম। আর এই লোভের তাড়নাতেই একে অন্যের সঙ্গে প্রায়ই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। "হোমো, হোমিনি, লুপাস", শোপেনহাওয়ার বলেছেন, মানুষই মানুষের কাছে নেকড়ে বাঘ. তার সবচেয়ে বড় শত্রু। জীবন কেন দুঃখময়, কেন অর্থহীন, তার অন্যতম কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

Finally and above all life is evil because life is war. Everywhere in nature we see strife, competition, conflict and suicidal alternation of victory and defeat. Every species fights for the matter, space and time of the others.

৩

সমস্ত মানুষের মনে আর পাঁচজনকে ছাড়িয়ে বড় হওয়ার আকাংক্ষা ও অপরের মনে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক দুর্জয় আবেগ শাশ্বত এবং স্বতোৎসারিত। যারা মনে করেন, এ আকাংক্ষা এ আবেগ অবাস্তব এবং অবান্তর তাঁদের ধারণা এক সচেতন সত্তার অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে যে গতিশীলতার দ্বারা প্রতিটি বস্তু স্পন্দমান, সেই গতিশীলতাই অতিমানবতা লাভের আকাংক্ষারূপে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের সচেতন সত্তার সঙ্গে বিধৃত। কোন বস্তু যেমন তার সীমিত দেহাবয়বের বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে তার সমস্ত প্রাণশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না, বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এক পূর্ণতর ও উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে চলে অবিরাম, তেমনি কোন মানুষও একই সমতলভূমির উপর সকলের সঙ্গে এক সহজ সমতার সম্বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চায় না চিরদিন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সহজ সমতলভূমি হতে অতিমানবতার হৈমচূড়ার উপর নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে হলে যে শক্তি ও সাধনার প্রয়োজন তা সকলের নেই বলেই তা তারা পারে না।

তবু এ আকাংক্ষার নিবৃত্তি নেই এবং এই আকাংক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ছোট বড় কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ত্যাগ, দয়া, মায়া, সহানুভূতি প্রভৃতি যেসব গুণগুলির আমরা বড়াই করে থাকি, সেগুলি বস্তুতঃ অপরের মনে প্রভুত্ব বিস্তারের মধ্য দিয়ে এক সূক্ষ্ম আত্মতৃপ্তি লাভের এক অভিনব প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তা যদি না হত তাহলে কোন দুঃস্থ ব্যক্তির দুঃখে মমতা জানালে অথবা তাকে কিছু দান করলে সচেতন মনের সমস্ত সচেষ্ট সহানুভূতির বুক ফুঁড়ে আত্মগরিমাবোধজনিত গোপন অথচ আনন্দোদ্বেল একটা অনুভূতি মাথা তুলে উঠত না আমাদের অবচেতন মনে। আমাদের যে কোন তথাকথিত নিঃস্বার্থ দয়া বা ত্যাগের উল্টোদিকে অপরের মনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার একটা স্বার্থঘন কামনা অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে থাকে।

প্রেমও প্রভুত্বের স্পৃহা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোন প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদের ব্যক্তিসত্তার এক বিশেষ মূল্য স্বীকারটাই বড় কথা নয়; কৌশলে প্রেমাস্পদের আত্মাটকে জয় করে সেই বিজিত আত্মার উদার ও অখণ্ড আঙিনায় নিজের এক বিশেষ মূল্যকে একমাত্র ও অবিসংবাদিত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসটাই হলো আসল কথা এবং পারাটাই হলো সার্থকতা। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে স্বার্থসম্পৃক্ত অনুভূতি। বেঞ্জামিনের ভাষায় বলা যায় : "L'amour est de tons les sentiments le phis egoiste...."

যখন কোন প্রেমিক দেখে তার প্রেমাস্পদের দেহ মন অপরের দ্বারা অধিকৃত, তখন সে সব প্রেমের কথা ভুলে গিয়ে তার প্রেমাস্পদকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

মানুষের সত্যের প্রতি যে ভালবাসা তাও নিঃস্বার্থ নয়। যে কোন নারীকে যেমন মানুষ কুমারী রূপেই লাভ করতে চায় তেমনি যে কোন সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রেও মানুষ চায় প্রথম আবিষ্কারের বিজয় গৌরব।

মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সহজাত ও দুর্জয় প্রবৃত্তির কাছে নীতি ও যুক্তির কোন দাম নেই। মানব মনের যে সচেতন সত্তার স্তরে নীতির অনুশাসন সে স্তর অতি সংকীর্ণ এবং সামান্য; তার ঠিক নীচের তলায় অবচেতনের যে বিশাল দুর্জ্ঞেয় প্রকোষ্ঠ সেখানে শুধু অন্ধ প্রবৃত্তির অন্তহীন একাধিপত্য। অন্ধ হলেও এ প্রবৃত্তি এতদূর বলিষ্ঠ যে অবচেতনের গভীরে অবস্থান করেও সচেতন মনের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্তরবৃত্তিকে তার নির্দেশানুসারে চলতে বাধ্য করে। এমনকি দার্শনিকদের তত্ত্বচিন্তার মধ্যেও আত্মনিরপেক্ষতার মিথ্যা অবগুণ্ঠনটাকে সরিয়ে দিলেই দেখা যাবে এই প্রবৃত্তিরই প্রাধান্য।

Philosophical systems are shinning mirages; what we see is not the long sought truth, but the reflection of our own desires.

সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বই হলো এক ভ্রান্ত ঔজ্জ্বল্যে দ্যুতিময়; আমরা তার মধ্যে যেটাকে সত্য বলে মনে করি আসলে সেটা বহু আকাংক্ষিত সত্য নয়, সেটা আমাদেরই ব্যক্তিমনের তির্যক প্রতিফলন।

৪

সমাজ বলে কোন জিনিষের অস্তিত্ব নেই। সমাজ বলে আমরা সাধারণতঃ যেটা অভিহিত করে থাকি, সেটা হচ্ছে আত্মসত্তাহীন অজস্র মানুষের এক বিরাট উইঢিপি। পুঞ্জীভূত জড় জীবনের উইঢিপিটা থেকেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে এক একজন মানুষ, যাঁরা তাঁদের শক্তিও সাধনার দ্বারা এমন এক মোহপ্রসারী ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন যার সাহায্যে বহু মানুষের খণ্ড খণ্ড মানসভূমিকে আচ্ছন্ন করে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক প্রাসাদদুর্গ গড়ে তোলেন তার উপর। আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই সে প্রসাদ দেখে।

যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলের অধিকার সমান বলে যতই প্রচার করা হোক না কেন, কার্যতঃ কিন্তু দু-চারজন শক্তিমান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই প্রাধান্য দেখা যায় সেখানে। If equal political power is just, why not equal economic power? Why should there be leaders anywhere?

রাজনৈতিক অধিকার যদি সকলের সমান হয়, অর্থনৈতিক সাম্যের কেন তবে কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে? সকল মানুষ যদি সমান হয়, কেন তবে নেতার প্রয়োজন হয় সেখানে?

যাঁরা নীৎসের সঙ্গে সঙ্গে একমত হতে পারেন না, অতিমানবতালাভের উৎকাংখাকে

যাঁরা অবান্তর বলে উড়িয়ে দিতে চান তাঁরা কিন্তু এই সহজ এবং সুচিরকালীন প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারেন না।

নীৎসের দর্শন কিন্তু শুধু 'ডাউট' ও 'ডিনিয়াল' এর দর্শন নয়। শুধু এক উগ্র নেতিবাচক সংশয়বাদের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি তাঁর সমস্ত প্রয়াস ও প্রতিশ্রুতি। যাঁরা মনে করেন, তেইশ বছর বয়সে সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হয়ে ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে পাঁজরা ভেঙ্গে ফেলায় বীর যোদ্ধা হতে পারেননি বলেই সারাজীবন শুধু যুদ্ধের জয়গান গেয়ে গেছেন নীৎসে, তাঁরা সত্যিই তাঁকে ভুল বোঝেন। যাঁরা মনে করেন, তিনি যে অতিমানবের স্বপ্ন দেখেছেন তা তাঁরই অতৃপ্ত কামনার ভাবমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং শৃংখলোন্মুক্ত এক শক্তি ও প্রবৃত্তির জীবন্ত প্রতীকরূপে সমস্ত ন্যায় ও নীতিকে পদদলিত করে ধ্বংসের ধ্বজা উড়িয়ে বেড়ানোই সে অতিমানবের কাজ, তাঁরা মনে হয় নীৎসের খণ্ড রচনা পড়েই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, মনে হয় নীৎসের সমগ্র সৃষ্টির নির্যাসে অভিসিক্ত হয়নি তাঁদের মন।

নীৎসে প্রথমে দেখিয়েছেন মানুষ সাধারণতঃ কি হয়ে থাকে; তারপর তিনি দেখিয়েছেন মানুষের কি হওয়া উচিত। তাঁর দর্শন একাধারে 'পজিটিভ্' ও 'নরম্যাটিভ্'। মানবমনের গঠন বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন চিন্তা অনুভূতি ও প্রবৃত্তির স্বরূপও গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের দ্বারা তিনি প্রথমে দেখিয়েছেন মানুষ প্রবৃত্তির দাস; পরে বলেছেন এই প্রবৃত্তিকেই বশীভূত করে অতিমানবত্বলাভের পক্ষে একান্ত সহায়ক করে তুলতে হবে।

যদি জৈবশক্তিকেই সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুর চূড়ান্ত মূল্য নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করতেন নীৎসে, তথাপি একথা তিনি স্পষ্ট করে বলে গেছেন যে, শুধু জৈবশক্তি নয়, অতিমানবত্বলাভের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধারণের একান্ত প্রয়োজন। নীৎসের মতে এক মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে দুর্বল বুদ্ধিবৃত্তিকে করতে হবে শক্তিশালী; বলিষ্ঠ ও চঞ্চল প্রবৃত্তিকে করতে হবে সংযত। এই মহৎ উদ্দেশ্যের পতাকাতলে শক্তি, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে ঐক্যবদ্ধ করাই হলো অতিমানবের কাজ।

Energy, intellect and pride—these make the superman. But they must be harmonized; the passions will become powers only when they are selected and unified by some great purpose which moulds a chaos of desires into the power of a personality.

এই মহৎ উদ্দেশ্যে হলো অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক অতিমানব হওয়ার উদ্দেশ্যে যার দেহ হবে বলিষ্ঠ এবং সুন্দর, আত্মা হবে যার পরিপূর্ণ, আর অতুলনীয় হবে যার বুদ্ধিমত্তা ও পৌরুষবীর্য। শক্তি, বুদ্ধি, অর্থ বা প্রতিপত্তি—এদের মধ্যে যে কোন একটিকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য (end in itself) বলে মেনে নিয়ে যারা তার সমস্ত উদ্যমের অপচয় ঘটায় তাদের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। বুদ্ধি, শক্তি ও প্রবৃত্তির সুষ্ঠু সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই কোন জীবন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদ জগতও জীবনের সংগে সকল বাস্তব সম্পর্ক হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কেউ দিনরাত প্রায়ন্ধকার একটি রুদ্ধদ্বার ঘরে বসে চিন্তা করে তবে তার ফল কখনো শুভ হতে পারে না। যে মনের স্বাস্থ্যকে দৈহিক স্বাস্থ্যের থেকে অঙ্কে বেশী মূল্য দিয়েছেন সারা জীবন, সে মনের স্বাস্থ্যকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারলেন না নীৎসে। অপরিমিত মানসিক শ্রম আর আত্মনিগ্রহের ফলে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে টুরিন শহরে থাকাকালীন উন্মাদ হয়ে উঠলেন এবং বছর কতক পরেই অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটল তাঁর। তাঁর অক্লান্ত শ্রম আর

একনিষ্ঠ সাধনার ফলস্বরূপ ব্যাপকতর কোন স্বীকৃতি বা সম্মান তাঁর জীবিত অবস্থায় কিছুই পেয়ে যাননি নীৎসে। কিন্তু তাঁর কোন ক্ষোভ ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর সমগ্র জীবনের যে চিন্তার ফসল বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে নিঃশেষে তুলে দিয়ে গেছেন, তার দাম তিনি জীবনে পাবেন না। তাই তিনি বলে গেছেন, আমাকে বোঝবার দিন আজও আসেনি; আমি হচ্ছি আগামী কালের জন্য।

নীৎসের মৃত্যুর সংগে সংগে উনিশ শতকের একটি শ্রেষ্ঠ চিন্তার বেগবতী স্রোত তার উৎস দেশ হারিয়ে ফেলেছে সত্যি; কিন্তু নীৎসের সমস্ত চিন্তার প্রাণরস শুধুমাত্র একটিযুগের বস্তুরেখার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে আত্মলোপ করবে সহসা শোচনীয়ভাবে, একথা ভাবতেও অস্বীকার করবে তাঁর পাঠকদের মন। তাঁর চিন্তার প্রাণবন্তু উনিশ শতককে স্বচ্ছন্দে উত্তরণ করে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসেও সমান স্রোতস্বতী। নীৎসে আজও অমিতপ্রভব। তাঁর আত্মকেন্দ্রিক অতিমানব প্রত্যয় ইউরোপের বিভিন্ন মনীষী ও সাহিত্যিকদের চিন্তার স্তরে এসে সজীব হয়ে তাঁদের কল্পনাকে নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে এবং তা অতি সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য সুন্দরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে তাঁদের বিভিন্ন রচনায় বিশেষ করে জর্জ বার্নাড শ' এর 'দি ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যানে' প্রসিদ্ধ ইতালীয় লেখক গ্যাব্রিয়েল দ্যা আন্নুৎসিওর বিভিন্ন উপন্যাসে এবং আলবেয়ার কামুর 'দি ফল' উপন্যাসের ক্লামেন্সের এটনার চূড়া হতে সিসিলি দ্বীপকে দেখার প্রতীকী চিন্তার ভাববস্তুতে।

প্রদত্ত অস্তিত্বের সহজ সমতল হতে আর সকলের সত্তার সীমাকে অতিক্রম করে উর্ধে উৎক্রমণের পথে দূর আকাশ পরিক্রমার যে আদর্শ 'নিউ রোমান্টিসিজম' নামে খ্যাত হয়ে সাহিত্যে একটি নূতন দিকের সন্ধান দিয়েছে, তার আলো কতদিন অম্লান থাকবে তা ঠিক হয়ত বলা যেতে পারবেনা; তবু একটা বিশেষ স্থিতির সংগে একথা বলা যেতে পারে যে, এ আলোর খরদ্যুতি নীৎসে সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারনার কুহেলি সরিয়ে তাঁর চিন্তার সত্যটাকে অনেকখানি স্পষ্ট করে প্রতিভাত করে তুলবে।

ক্লাসিসিজম

দেবব্রত চক্রবর্তী

খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ল্যাটিন লেখক অলাস্ গিলিয়াস্ তাঁর "নক্টেস্ অ্যাটিকী" গ্রন্থে 'স্ক্রিপ্টর প্রোলেটারিয়াস' শব্দটির বিপরীতার্থে 'স্ক্রিপ্টর ক্লাসিকাস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তখন এর অর্থ ছিল—একজন অভিজাত লেখক যিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর রচনা বিদ্যালয়ের ক্লাস-এর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। বহু শতাব্দী পরে এক ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে চতুষ্পাঠী অথবা মহাবিদ্যায়তনে স্থায়ী অধ্যয়নের উপযোগী হিসেবে অনুমোদিত গ্রন্থকার অথবা গ্রন্থের প্রতি এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়। এই অর্থই মধ্যযুগের ও রেনেসাঁসের ল্যাটিন সাহিত্যে প্রবলতর ছিল এবং তার থেকেই আধুনিক ভাষায় শব্দটি চ'লে এসেছে। মানবতাবাদীরা গ্রীক ও রোমান পরমসৃষ্টিকেই এরকম অধ্যয়নের উপযোগী একমাত্র সাহিত্যকৃতি ব'লে বিবেচনা করেছেন। সুতরাং ধারণা হ'ল যে, গ্রীস ও রোমের দিক্‌পাল সাহিত্যিকবৃন্দই রচনা করেছেন ক্লাসিক্‌স্। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে একথা বলা যায় যে, তাঁদের ছাড়াও অবর-ভাষায় এমন কিছু সৃষ্টি রয়েছে যা ক্লাসিকেরই সমপর্যায়ে উন্নীত। ফলে এরকম একটি ভাবের উদ্দীপন হ'ল যে, প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালের ক্লাসিকই সৌন্দর্যের নিরতিশয় ও কল্পনীয় আদর্শের এবং সুসংগত ও উৎকর্ষের চিরন্তন নিরিখের বাস্তব রূপায়ণে অগ্রণী হয়েছে। এই যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির ভাব ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে রেনেসাঁস থেকে রোমান্টিসিজমের দেহলীতে পরিণতি লাভ করেছে। তার পরিচয় এখনো রয়েছে ব্যাবিট-এর সংজ্ঞায়—"ক্লাসিক্যাল ইজ এভ্‌রিথিং দ্যাট ইজ রিপ্রেসেন্টেটিভ অফ এ ক্লাস।" ক্লাসিক্যালের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের এটি দ্বিতীয় ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, কারণ ব্যাবিট 'ক্লাস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'ক্যাটেগোরি'-র দার্শনিকবোধে অর্থাৎ একটি 'মেটাফিজিক্যাল অব ট্রান্সেন্ডেন্টাল এনটিটি' বা বিশেষ পদার্থ বা ঘটনাধারার উপস্থাপন করে।

যদি আমরা এই শেষের দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করি তবে গ্রীক সাহিত্যই একমাত্র প্রকৃত ক্লাসিক্যাল। কারণ গ্রীস মূর্ত সৃষ্টিতে রচনা করেছে নন্দনবৃত্তির পরিপূর্ণতার অতীন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞালভ্য সাধারণ পর্যায়। রোম একেই অনুসরণ করেছিল এবং তারপর রেখে গিয়েছিল উত্তর-কালের সাহিত্যপরম্পরার জন্যে। গ্রীস কিন্তু ঐ সব রচনা করেছিল আপন সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকার ক'রে, পূর্ববর্তী কোনো আদর্শকে সে অনুসরণ করেনি। জার্মান রোমান্টিসিস্ট-দের দাবীর উত্তরে প্রকৃত কথা হচ্ছে গ্রীক সাহিত্য ছিল হেলেনীয় প্রকৃতির জাতীয় ও মৌলিক প্রকাশ। আর ল্যাটিন ও আধুনিক ক্লাসিসিজম গ'ড়ে উঠেছে গ্রীক আদর্শেরই ভিত্তির উপর। সুতরাং ল্যাটিন, রেনেসাঁস অথবা ফরাসী ক্লাসিসিজমের অর্থে গ্রীক সাহিত্য ক্লাসিক্যাল নয়।

ল্যাটিন সাহিত্যের অবনতির গোড়ার দিকে 'ক্লাসিকাস' শব্দটির উদ্ভব। কিন্তু মহৎ স্রষ্টাকে মর্যাদা দানের ও সেই স্রষ্টাকে অনুকরণ ক'রে নোতুন সৃজনের অর্থে ক্লাসিসিজমের যে-ধারণা তা আরও প্রাচীন। এর সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে আলেকজান্দ্রিয়ান যুগের অবনত গ্রীক সাহিত্যে। এ যুগের কবিদের সৃজনী-প্রতিভা হয়তো বেশি ছিল না, তবে তাঁরা অতি সুন্দর সূক্ষ্মতা ও নির্মল রুচিবোধের অধিকারী ছিলেন। ক্লাসিসিজম অর্থে যদি সুন্দর অতীতের শ্রেষ্ঠ কৃতির অন্তর্নিরূঢ় নানানভাবনিষিক্ত মৌলিক তথ্যের বীক্ষণ হয়, তবে আলেকজান্দ্রিয়ান

যুগের সাহিত্যিকেরা ছিলেন প্রথম ক্লাসিসিস্ট। আর যদি আমরা মেনে নিই ব্যাবিট-এর ব্যাখ্যা, তবে তাঁরা হলেন পরোক্ষ প্রকাশ। এ অর্থে তাঁরাই প্রথম নিও-ক্লাসিসিস্ট বা সিউডো-ক্লাসিসিস্ট।

আলেকজান্দ্রিয়ান যুগের কবিরা যা করলেন গ্রীক সাহিত্যে, রোমান লেখকরা তা-ই করলেন ল্যাটিনে। ভার্জিল অনুকরণ করলেন হোমার ও থিওক্রিটাস-কে, হোরেস গ্রীক গীতি-কবিদের, সিসেরো বাগ্মী ও দার্শনিকদের, ট্যাসিটাস ঐতিহাসিকদের, প্লটাস ও টেরেন্স ব্যঙ্গ অভিনেতাদের, আর কাটুলুস এবং ওভিড একই রকমের আলোচনা করলেন—"আর্স পোয়েটিকা" ও "ইনস্টিটিউসন্স অরেটরী"। হেলেনিস্টিক সভ্যতার দুই শতাব্দী আগে অ্যারিস্টটল ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকারীদের মধ্যে যাঁকে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ব'লে মনে হয়, তিনি রোমান কবি হোরেস। এই অধ্যায়ে সাহিত্য-অধ্যয়ন তখনো সুরু হয়নি এথেন্সে, সুরু হয়েছে পারগেমাম্-এ অ্যাটালিড্স-এর রাজধানীতে আর টলেমিস-এর রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায়। তবে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের জন্যে এই অধ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করেনি। ইতিহাস শুধু উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে লুপ্ত গ্রন্থের নামে আর পরবর্তী লেখক, যেমন ভূগোলশাস্ত্রবিদ স্ট্রাবো, জীবনীকার প্লুটার্ক অথবা মহাকোষ-রচয়িতা ডায়োজিনিস-এর নামে, এবং অধুনা আবিষ্কৃত মিশরের খণ্ডিত প্রাচীন পুঁথির নামে। পর্যায়ক্রমে প্রমাণপত্রের অল্পতার কারণ মনে করিয়ে দেয় যে, হেলেনিস্টিক অধ্যায় কোনো সাহিত্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত রচনা করেনি যার সঙ্গে এথেন্সের চতুর্থ শতকের রচিত সিদ্ধান্তের তুলনা করা যায়, হেলেনিস্টিক অধ্যায় কোনো সাহিত্যশিল্প সৃষ্টি করেনি যার সঙ্গে পেরিক্লীন যুগের অথবা হোমারিক যুগের সাহিত্যশিল্পের তুলনা করা যায়। এই অধ্যায় দৃঢ় অধ্যয়ন, রীত্যানুসারিতা, পারিভাষিকত্ব এবং সে সঙ্গে চরম নন্দনবাদ, সাহিত্যবিষয়ক নূতনত্ব ও রুচিশীলতার জন্যে পরিচিত। তখন শুধু যে বৈয়াকরণ, ভাষ্যকার, ভাষাতাত্ত্বিকেরাই প্রধান ছিলেন তা নয়, বিদগ্ধ কবি, গাথাকবি, আলঙ্কারিকেরও অভ্যুদয় হয়েছিল। যখন রোডস-এর অ্যাপোলোনিয়াস তাঁর রোমান্স এপিক "আরগন্যাটিকা"-র চারখানি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন তৃতীয় শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে, তখন তাঁর পূর্বতন নির্দেশনামা বিদগ্ধ কবি ক্যালিমেকাস তার তীব্র সমালোচনা ক'রে বললেন—'আবর্তমান কাব্য এমন একটা সাধারণ পথ হয়েছে যা প্রত্যেকে ব্যবহার করে, কিন্তু আমি এ ধরণের কাব্য ঘৃণা করি।' তিনি বললেন, 'বড় বই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিরক্তিজনক।' হোমার, নাট্যকার ও গীতিকবিদের রচনা সম্পাদনে ও তাঁদের গ্রন্থবিষয়ে সমালোচনায় এই শতাব্দী বিখ্যাত। এই শ্রমসাধ্য কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ান মিউজিয়াম-এর প্রথম গ্রন্থাগারিক জেনোডোটাস এবং তাঁর সমসাময়িক বা অল্প কিছু পরবর্তী কালের ইরেটোস্থিনিস, বিজ্যান্টিয়াম-এর অ্যারিস্টোফেনিস এবং অ্যারিস্টর্কাস।

হোরেস-এর সমগ্র কাব্যপ্রবাহ আলেকজান্দ্রিয়ান রম্য-সাহিত্য-প্রবণতা ও প্যাট্রিশন প্রত্ন-তাত্ত্বিকতার বিরুদ্ধে অগাস্টান প্রতিক্রিয়ার অংশ। কিন্তু হোরেস-এর "আর্স পোয়েটিকা" ও অ্যারিস্টটল-এর "পোয়েটিক্স" অথবা প্লেটো-র "ফীড্রাস"-এর মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। হোরেস-এর কবিতা ও সমালোচনা ছিল অগাস্টান ক্লাসিক্যাল আন্দোলনের অংশ, যে-আন্দোলন গ্রীক ক্লাসিক্যাল শিল্পের নীতিগত প্রাচুর্য নয়, গভীর গুরুত্বের দিকে গতি পরিবর্তন করেছিল। যখন ক্লাসিক্যাল-এর মান শুধুমাত্র গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে না হ'য়ে অনুন্নত ভাষার রচনার প্রতিও প্রযুক্ত হ'ল তখনই সুরু হ'ল ক্লাসিক্যাল-এর ধারণা সম্বন্ধে পূর্ব-মীমাংসার গতিপরিবর্তন। কবি পেত্রার্ক-এর চেয়ে গদ্যলেখক বোকাচ্চিও অনেক বেশি চেষ্টা করেছিলেন মাতৃভাষাকে ল্যাটিনের ভাবে রূপান্তরিত করতে। রেনেসাঁসের দ্বিতীয়ার্ধে এই উন্নতি শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল। ল্যাটিন কবিতা ও গদ্যের সর্বস্বীকৃত শিল্পগুরু ভার্জিল ও

সিসেরো-র পর পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিও শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুকৃত হয়েছেন। তাঁদের থেকেই সাহিত্য ও ভাষাসম্বন্ধীয় বিধিবিধান উদ্ভূত হয়েছে। আর ইটালীয় ভাষা আপন ইচ্ছায় নিজেকে ধরা দিয়েছে দুটি গ্রন্থের বন্ধনে। গ্রীস ও রোমের এসব ক্লাসিক ছাড়া অবর-ভাষার সাহিত্যে মহৎ সৃজনের অভাব ছিল। বোকাচ্চিও ও পেত্রার্ক-এর সংহিতা ছিল আরোহমার্গে অর্থাৎ কার্য থেকে কারণে, এখন নোতুন মান নির্ণীত হ'ল অবরোহমার্গে অর্থাৎ কারণ থেকে কার্যে। তাই অ্যারিস্টটল-এর শিভ্যালরিক রোমান্সের কথা বিস্মৃত হ'য়ে ট্রিসিনো আধুনিকদের জন্যে ক্লাসিক্যাল এপিকের নিয়মাবলী ঘোষণা করলেন। অনুরূপভাবে ক্রিশ্চিয়ান ড্রামা-র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে তিনি স্থাপন করলেন ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডির শাস্ত্রবিধি। ক্যাসেলভেট্রো এবং অন্যান্য অনেকে অ্যারিস্টটল-এর কাব্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন বিস্তৃতভাবে। এ'দের মধ্যে অল্প কয়েকজন পড়েছেন, অনেকেই আলোচনা করেছেন, কিন্তু কারও তেমন বোধগম্য হয়নি। ফলে ধারণা হয়েছে যে, ইটালীয় রেনেসাঁস সাহিত্য অবর-ভাষায় ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের সমৃদ্ধ অথচ ভয়াল রূপ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী ঐ রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু যেহেতু ইটালীয়গণ ল্যাটিন লেখকদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করল, তাই ফরাসীরা তাদের দৃষ্টিকে এককেন্দ্রিক করল গ্রীকদের প্রতি। রেসাইন চেয়েছিলেন আধুনিক সফোক্লিস হ'তে, আধুনিক সেনেকা হ'তে নয়। এমন কি ল্যাটিন রীতির শ্রেষ্ঠ অনুকারী লেখক বয়লো শুধু যে হোরেস-এর "আর্স পোয়েটিকা" অনুকরণ করেছিলেন তা নয়, সে সঙ্গে অনুবাদও করেছিলেন সিউডো-লঙ্গিনাস গ্রন্থ "অন দি সাব্লাইম"। "অন দি সাব্লাইম"-এর সর্বাপেক্ষা অসাধারণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি হচ্ছে বিচারের বৈচিত্র্য, কবিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। এতে শুধু যে শ্রোতৃবর্গের সুখদুঃখের অনুভূতি, লেখকের প্রতিভা, অলঙ্কার উদ্ভাবনের পরিচয়ই রয়েছে তা নয়, রয়েছে সমদৃষ্টিসম্পন্ন এই ভাব যে, মহৎ কবিতা সকলকে সবসময়েই আনন্দদানে সক্ষম, আর রয়েছে বিষয় প্রসঙ্গে সম্পর্কের ভাবান্তর। এই ভাব হচ্ছে মানসিক গৌরবের প্রতিরূপ হিসেবে প্রাকৃতিক মহিমার ভাব। আমরা যদি ধ'রে নিই যে, লেখক বলতে চেয়েছেন আত্মার ভূমাবস্থা পরিমিত হয় একটি কবিতায় উদ্ধৃত বাহ্যিক বিষয়ের মান দ্বারা, তবে তাতে কিছু বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। লঙ্গিনাস ছিলেন অসাধারণ আলঙ্কারিক, তাই তিনি একটি সমস্যার দুটি দিককে উপস্থাপিত করেছিলেন—একদিকে প্রচলিত অলঙ্কারের পারিভাষিকত্ব ও সংজ্ঞা এবং অপরদিকে আত্মা ও তার চিন্তা ও আবেগের অবর্ণনীয় বোধ, যাকে তিনি সবিশেষ নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন অনালঙ্কারিক পরিসরে। আলঙ্কারিক কাব্যতত্ত্বের নির্বাহে মধ্যযুগ ও ক্লাসিক্যাল প্রাচীনত্বের পার্থক্য ছিল যে-কোনো ক্লাসিক্যাল প্রবণতার হ্রাস ও সে সঙ্গে রীত্যানুসারী, অপরিবর্তনীয় ও চিরব্যবহারসিদ্ধ প্রবণতার বৃদ্ধি—এই প্রবণতা হচ্ছে শিল্প ও ভাষার কৃত্রিম সৌষ্ঠব, কাব্যের রূপ-রস-গন্ধের আবহাওয়ার ঘনতা। কর্নিল্লে এবং মলিয়ের-এর আংশিক ব্যতিক্রমসহ ফরাসী সুবর্ণ যুগ সম্বন্ধে বলা যায় যে, এটি একমাত্র সাহিত্য যা গ্রীক ও ক্লাসিক্যাল আদর্শের মর্যাদাপূর্ণ।

যেমন ইংল্যাণ্ডে শেকসপীয়র-এর যুগ সম্বন্ধে ক্রমোন্নতির মাত্রা নিরূপণের জন্যে দীর্ঘদিন তাঁকে 'বারব্যারিয়ান অফ জিনিয়াস' এবং 'এ ব্যানার অফ রোমান্টিসিজম' এই উভয় আখ্যায় ভূষিত করা হ'ত। কিন্তু ক্লাসিসিজম বলতে যদি অনুকরণের তত্ত্ব ও রীতি বোঝায় তবে শেকসপীয়র-এর সময়েও ক্লাসিসিজম ছিল। এটি ছিল দৃঢ় সাহিত্যভঙ্গি অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক রূপ—তাই বলা যেতে পারে প্রায় ক্লাসিক্যাল নিদর্শন। সিডনী-র "ডিফেন্স"-এর উৎস ছিল ক্লাসিক্যাল, কিন্তু তার প্রকৃতিকে দৃঢ়ভাবে ত্রুটিহীন ক্লাসিক্যাল বলা যায় না। এর চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ ক্লাসিসিজম দেখতে পাওয়া যায় বেন জনসন-এর রচনায়; তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের লোক ছিলেন

এবং তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল ক্লাসিসিজমের কঠোর লবণাক্ত ও কণ্টকাবৃত কমিকো-স্যাটায়ারিক বিভাগে। স্পেনীয় সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল সময়কে বলা হয় ক্লাসিক্যাল যুগ। এখানে আবার ইটালীয় সংস্কৃতি ল্যাটিন ও গ্রীক প্রভাব অপেক্ষা অধিকতর বলবান এবং জাতীয় প্রাণময়তা সর্মাধক শক্তিশালী। ইটালীয় রেনেসাঁসের ভাষাতত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্ত সূক্ষ্মতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শেকসপীয়র ও মলিয়ের-এর মতো সার্ভন্তেস্ ও ক্যালডেরোন এরকম বন্ধন থেকেই স্বাধীনভাবে রচনা করেছিলেন। ফলে স্পেনীয় সাহিত্যের এই অধ্যায়কে রোমান্টিক আখ্যায় বিশেষিত করা হয়। এই অপনাম অন্যের অপ্রতুলতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ফরাসী ভাবানুবাদ ১৬৬০-৮৮ খৃষ্টাব্দের ইংল্যাণ্ডের বিনীত সাহিত্যচক্রে সর্বাপেক্ষা কার্যকর বাহ্য প্রভাব ছিল ফরাসী ক্লাসিসিজম, যা করনিল্লে ও রেসাইন-এর নাটকের মধ্যবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে, এটি জ্ঞানলোক ও মহাকোষের যুগ। লেখকেরা শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন দার্শনিক। ক্লাসিক্যাল আদর্শ এত বেশি প্রচলিত ও নির্জীব হ'য়ে পড়ে যে, একে সিউডো-ক্লাসিসিজম বলা হয়। এই প্রভাব সমগ্র য়ুরোপের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যাণ্ডে ড্রাইডেন ও পোপ অনুসরণ করলেন শেকসপীয়র ও মিল্টন-কে। আলেকজাণ্ডার পোপ শুধুমাত্র ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত ও ঐতিহ্যের আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট হননি, সেই সঙ্গে তার দৃষ্টান্তও দিয়েছেন, কারণ তিনি হোরেসিয়ান "আর্স" ও ক্লাসিক্যাল ঔজ্জ্বল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্লাসিক্যাল কবিতা লিখেছেন। ফরাসীর এই সাহিত্যের মধ্যমশ্রেণীর অনুসরণকারীরা স্পেন, জার্মানি, ইটালিতে সমবেত হলেন। হোরেস ও বয়লো-র প্রভাবে অনেক 'আর্টেস পোয়েটিকী' লেখা হয়েছিল—গ্রাভিনা-র "রেজিয়ন পোয়েটিকা", পোপ-এর "এসে অন ক্রিটিসিজম", লুজান-এর "পোয়েটিকা"। এমন কি লেসিং-এর "ল্যাওকুন" হচ্ছে এ ধরণের শেষ রচনা। "ল্যাওকুন"-এর অল্প পরেই লিখিত "হ্যাম্বুর্গ ড্রামেটার্জি"-তে ধারাবাহিক নাট্যসমালোচনায় লেসিং ফরাসী ক্লাসিক্যাল নাটকে ভলটেয়ারিয়ান বীরত্বের আতিশয্যের প্রতি তীব্র অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। তবু লেসিং ছিলেন একজন ক্লাসিক্যাল সমালোচক। লেসিং ও জার্মান সমালোচনাতত্ত্বের ক্রমবিকাশের পরবর্তী প্রধান পুরুষ জে. জি. হার্ডার-এর মধ্যে একজন ইচ্ছুক পাঠক স্পষ্ট রেখা অঙ্কন করবেন ক্লাসিক ও রোমান্টিক বিরোধ স্বীকার করতে। জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তারা গটশেড-এর যুগকে বলেন সিউডো-ক্লাসিক্যাল, ফরাসী ক্লাসিসিজমেরই স্থানান্তরিত রূপ। তবে শিলার ও গ্যটে-র গৌরবোজ্জ্বল সময়কে তাঁরা জার্মানীর নিজস্ব ক্লাসিক্যাল যুগ বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। তুলনার জন্যে তাঁরা এই শব্দটি স্পষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পদ্ধতি ও তার তাৎপর্য ভয়ঙ্কর, কারণ গ্যটে-শিলার-এর উত্তরসূরীরা রোমান্টিসিজমের প্রথম পুরুষের নিকট সংস্পর্শে ছিলেন। তাই জার্মান ভিন্ন অন্য ইতিদাসবেত্তারা মাদাম দ্য স্টীল-এর ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে তাঁদের রোমান্টিক আখ্যা দিয়েছেন। ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক কবিতার পার্থক্য নিয়ে আজও এত আলোচনা, এত বিভাগ ও এত বিরোধিতা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তা প্রথম জন্ম নিয়েছিল শিলার ও গ্যটের হাতে। গ্যটে কবিতায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করলেন না, কিন্তু শিলার অতীন্দ্রিয় পথই অবলম্বন করেছিলেন, এবং তাকেই প্রকৃত পথ মনে ক'রে প্রমাণ করলেন যে, গ্যটে ছিলেন রোমান্টিক, তাই তাঁর "ইফিগেনিয়া" কোনো মতেই ক্লাসিক্যাল নয়। শ্লেগেল এই ভাবকে গ্রহণ ক'রে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন, যার ফলে আজও প্রত্যেকেই ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। জামানীতে 'স্টার্ম আণ্ড ড্র্যাং' ও রোমান্টিসিজমের মধ্যে একটি

আন্দোলন উত্থিত হয় এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগের দীপ্তি ম্লান ক'রে য়ুরোপে প্রসার লাভ করে। এর কেন্দ্র ছিল সাহিত্য নয়, নমনীয় শিল্প, বিশেষত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। শিল্প ও রীতির ক্ষেত্রে তাই একে বলা হোত আড়ম্বরের সাম্রাজ্য। এর তাত্ত্বিক ছিলেন হিবক্কেলমান, প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন ক্যানোভা, এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নেপোলিয়ন। এটাই প্রকৃতপক্ষে নিও-ক্লাসিসিজম। সপ্তদশ শতাব্দীর সিউডো-ক্লাসিসিজমের চরম সৃজন সৌন্দর্যের মানসিক ও আত্মিক কল্পনীয় মানের অনুসন্ধান ও তার প্রতি সংলগ্নতা রূপ বিবেচিত হয়। আবেগপূর্ণ ও মরমীয় উপাদানগুলি রূপলাভ করেছে হিবক্কেলমান-এ। এই সব কারণে বাইবেল-ধৃত শব্দের কোষে নিও-ক্লাসিসিজম ধর্মের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এরকম একটি ভাবের রোমাণ্টিক অস্পষ্টতা খুবই পরিষ্কার, তবু এটি ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যের অধীন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিসিজম বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দ্বারা সমর্থিত ছিল, এই যুক্তিবাদ ক্লাসিসিজমে প্রামাণিক মূল উপাদানের পরিবর্তে নোতুন ও দৈবিবপাকে খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল এর যুক্তিসিদ্ধ হবার দাবির ওপর।

এ কথা সত্যি যে, রোমাণ্টিকদের দিকে তাকালেই আমরা ক্লাসিক্যাল ধরণাকে বুঝতে পারি। প্রথমে তাঁরা স্থায়ীভাব যা মনের পর্যায়ে ক্লাসিসিজম ও রোমাণ্টিসিজমের মর্যাদা দিয়েছিলেন আবহমানকালের ঐতিহাসিক সংস্কার হিসেবে নয়। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, বয়লো ও রেসাইন-এর মতো প্রতিভা-সৃজনকারী সংস্কৃতি এবং শেকসপীয়র ও ক্যালডেরোন-এর মতো প্রতিভা-সৃজনকারী সংস্কৃতি—এদের মধ্যে রয়েছে একটি গভীর আত্মিক ব্যবধান। যদিও তাঁদের অনেকে গ্রীক সাহিত্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, অন্যেরা দেখলেন যে, সব প্রাচীন সৃষ্টিকেই ক্লাসিসিজমের বিভাগে চিহ্নিত করা যায় না, এমন কি সেটা তাঁদের পক্ষে নিন্দনীয়। আর তাছাড়া ল্যাটিন ও গ্রীকের মধ্যে পদ্ধতিগত ভিন্নতাও রয়েছে বিরাট পরিমাণে। সমস্ত ভ্রান্তি এড়িয়ে এই আবিষ্কারের সংগে রোমাণ্টিকেরা একত্রিত ধারণা ও ক্লাসিক শব্দটির এত বেশি ও এত বিভিন্ন প্রয়োগের সূত্র আমাদের কাছে বিশ্লেষণ করছেন। রোমাণ্টিক নন্দনতত্ত্ব দৃঢ়, সংগত ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলে যে শিল্পকবিতা হচ্ছে স্বাধীন সৃষ্টি, স্বতন্ত্র মৌলিক ক্রিয়াকলাপ। মহৎ স্রষ্টার সার্থক সৃষ্টির অনুকরণের অথবা বাস্তব সৌন্দর্যের অকল্পনীয় আদর্শের সংগে সৃষ্টির সমীকরণের দ্বারা শিল্পের জন্ম—নন্দনবৃত্তির এই বিশ্বাস যে-সময় প্রবল তাকেই বলা যেতে পারে ক্লাসিক্যাল যুগ।

এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, রোমাণ্টিক প্রবণতা ছাড়া নিও-ক্লাসিসিজমই হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ধারণার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এরপর মৌলিকতার নন্দনতত্ত্ব সর্বত্র জয়লাভ করে। সুতরাং রোমাণ্টিক হেলেনিজম ক্লাসিক্যাল পুনরুজ্জীবন নয়, রোমাণ্টিকসিজমেরই রূপকলা। শীনির ও হাল্ডারলিন, ফস্কোলো ও লেওপার্ডি, শেলী ও কীটস কিংবা একেবারে আধুনিক কবিরা রোমাণ্টিক অথবা ক্লাসিক্যাল কিনা, এ প্রশ্ন আমাদের নিজেদের এমন কি তাঁদেরও জিজ্ঞেস করা বৃথা। যদি ক্লাসিক্যাল প্রত্যয়ের গতি অব্যাহতও রাখেন তবু তাঁরা এক নোতুন জগতের অধিবাসী।

রোমাণ্টিসিজমও ঐতিহাসিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে আর একটি জিনিস বেশ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে যে, ক্লাসিসিজমের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ এটি অতীন্দ্রিয় নয়, আবার একটিমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপও এর নেই। বরং এটি হচ্ছে অনেক রূপের সমষ্টি, বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবণতা অনুসারে বিভিন্নভাবে যা বোঝা যায়। যাই হোক শব্দটি কোনো কোনো লেখকের কাছে গুণনির্দেশের পক্ষে এত সুখকর যে, তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগগুলির প্রতিই তা ব্যবহার করেন। যেমন, রেসাইন-এর প্রতি করা হয়েছে, আর বিশ্লেষ-

বশে ভলটেয়ার অথবা ডেলিল্লে-কে বলা হয়েছে সিউডো-ক্লাসিক্যাল। এরকম সংস্কৃতিগত পক্ষপাত, শব্দটির এ জাতীয় মূল্যবিচার আরও বেশি জটিলতা ও অসংগতি সৃষ্টি করেছে। যেমন, ফরাসী সাহিত্যের পরিভাষায় রয়েছে ক্লাসিক্যাল যুগ সিউডো-ক্লাসিক্যাল যুগের পূর্ববর্তী, কিন্তু জার্মানীতে ঠিক এর বিপরীতটিকেই স্বীকার করা হয়েছে।

ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সমালোচকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বা ঐক্য যেমন আছে তেমনি পরস্পর বিরোধিতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) উচ্চতম পর্যায়ের সাহিত্যকেই বলা হয় ক্লাসিক্যাল। অর্থাৎ যে-সাহিত্য সকল প্রকার রুচিবোধকে, মানসিক আবেগ-আকাঙ্ক্ষাকে, হৃদয়ের সৌন্দর্যানুভূতিকে তৃপ্তিদানে সক্ষম ও যে-সাহিত্য লিটারারি অ্যাট্রিবিউটস-এর কিরণসম্পাতে বৈশিষ্ট্যময় ও শ্রেষ্ঠত্বে ভাস্বর, সে-সাহিত্যই ক্লাসিক্যাল আখ্যায় বিভূষিত। খুব অল্পকালের মধ্যেই এ ধারণা বিলুপ্ত হয়।

(২) ক্লাসিক্যাল সাহিত্য হচ্ছে সেই সাহিত্য যা অধ্যয়ন ও কৌতূহলোদ্দীপনের দিক থেকে কালোত্তীর্ণ। অর্থাৎ যে-সাহিত্য কালপ্রবাহের তরঙ্গপ্রতিক্রিয়াতায় বা যুগধর্মের অভিসংঘাতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেনি কিংবা পাঠকমনের অন্তরঙ্গতার সীমারেখা থেকে দূরে স'রে যায় নি, যুগের পর যুগ, কালের পর কাল পেরিয়ে আজও পূর্বের মতো সমমাত্রায় জনপ্রিয় তাকে বলা যেতে পারে ক্লাসিক্যাল। এই অর্থ বর্তমানেও ব্যবহৃত হয়, তবে কিছক যান্ত্রিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে।

(৩) একমাত্র গ্রীক ও রোমান সাহিত্যকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল; এটা সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ অর্থ। তবে এতে বেশি জটিলতা নেই যদি আমরা মনে করি যে, পরবর্তী কালের পরিভাষায় গ্রীস একটি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতি নির্মাণ করেছিল।

(৪) প্রাচীন রচনারীতি, বিশেষত অগাস্টান যুগের ল্যাটিন সাহিত্যকে অনুসরণ ক'রে যে-সাহিত্য রচিত হয় তাকে ক্লাসিক্যাল বলে। প্রকৃত কথা, পূর্বতন সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি, বর্ণনা-বিন্যাস, চিন্তাধারা—এক কথায় প্রাচীন রচনাশৈলী যে-সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তার নাম ক্লাসিক্যাল সাহিত্য। এ বিষয়ে গ্যটে লিখেছেন—"আধুনিকদের জন্যে উৎকৃষ্ট ও অনুপম হবার একটি মাত্র পথ আছে তা হল প্রাচীনদের অনুকরণ করে।" এই যন্ত্রবোধই আরো সুষ্ঠু প্রকাশ আমরা দেখতে পাই হিবক্কেলমান-এর আলোচনায়—"...তাঁদের মতবাদ নয়, রচনাকে গ্রহণ ক'রে, তাঁদের জীবনকে পুনরঙ্কিত ক'রে এবং তাঁদের দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে অবলোকন করে।" এই অর্থই অসংগতি ও জটিলতার পথ খুলে দিয়েছে।

(৫) যে-সাহিত্যে লেখক-মনের স্বকীয়তা, বিশেষ দৃষ্টিপাতন, ব্যঞ্জনার সংক্ষেপতা—সর্বোপরি মানস-পরিমণ্ডল রূপায়িত, সে সাহিত্য ক্লাসিক্যাল। এ-জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃতিগত লক্ষণ হচ্ছে ভাবগভীরতা। উচ্ছ্বাসময় চঞ্চলতা থেকে মনের প্রকাশকে একটা সংযত ভাবগাম্ভীর্যের মাঝে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য।

সুতরাং ক্লাসিকে রয়েছে পরমশান্তি, পরমস্থৈর্য, চিরচেনা পরিধির মাঝের জগৎকে একান্ত ভাবে অনুভবের ধীর পরম-আনন্দ। ক্লাসিক লেখক জাগতিক রূপ-সৌন্দর্য-আনন্দ, ব্যথা গ্লানি-কালিমা, উদাম-শ্রান্তি, অনীহা-নির্বেদ, স্নেহ-প্রেম সব কিছুকেই আপন হৃদয়ের গভীরে সংস্কৃত ক'রে প্রকাশ করেন সকলজনের হৃদয়গ্রাহ্যরূপে। তিনি যা রচনা করেন তার রস-উপভোগের অধিকার বা ক্ষমতা শুধু তাঁর নিজস্ব নয়, তা সকলের, প্রতিটি মন ও মননের কাছে তার আবেদন। রচনার মাঝে স্রষ্টা একক মানুষ হিসেবে লুপ্ত, অনন্য মানুষ হিসেবেও তাঁর সত্তার কোনো পরিচয় নেই, তাঁর পরিচয় বৈশ্বিক মানুষ হিসেবে অর্থাৎ তিনি 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'।

(১) একটি ভাব সর্বজনীন ও চিরকালীন হয় তখনই যখন তা একমন থেকে অন্যমনে যাতায়াত করতে পারে বা জীবন্ত থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, সক্রেটিস এইভাবেই সর্বজনীন। এই অর্থে সবচেয়ে বেশি স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত রোমান্টিক কবিতাও সর্বজনীন হবে। তবে তাকে প্রাজ্ঞল ও বিভিন্ন মনের দিক থেকে সংগতিপূর্ণ হ'তে হবে।

(২) আরও একটি বিশেষ উপায়ে ভাব সর্বজনীন ও চিরকালীন হ'তে পারে, যদি তা অনেকের মনে অথবা সাধারণের মনে অথবা একজন স্বাভাবিক লোকের মনে স্থিতিলাভ করে, যে-মন শিক্ষিত বিকৃতীকরণের দ্বারা দূষিত নয়। খুব সহজ ব'লে সিদ্ধান্তকারী এরকম একটি ভাব প্রায়ই কল্পনা করেন। আদিমতাবাদের এই আদর্শে স্যামুয়েল জনসন-এর সহভাগিতার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

(৩) যখন বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখনই ভাব হয় সর্বজনীন ও চিরকালীন। যে-কোনো একটি সাধারণ বিশেষ্য দ্বারা প্রকাশিত ভাব সকলের মধ্যে প্রচলিত। যেমন, দর্শনশাস্ত্রে যিনি পণ্ডিত তাঁকে সকলেই দার্শনিক নামে অভিহিত করবে।

(৪) কল্পনাও সর্বজনের ও চিরকালের হতে পারে, আবার বাস্তবও তাই। "গালিভার্স ট্র্যাভেলস" রয়েছে, সে সঙ্গে রয়েছে "রাসেলাস"। ডিফো-র "জার্নাল অফ দি প্লেগ ইয়ার" রয়েছে, আর তারই পাশে রয়েছে "র‍্যাণ্ডলার"।

(৫) ভাব সর্বজনীন ও চিরকালীন হয় যদি তা দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়, যদি তার মাঝে ফুটে ওঠে সমগ্র জগতের ছবি। জাতিগত অখণ্ডকে সর্বব্যাপী অখণ্ডের পর্যায়ে উন্নীত করবার দিকে প্লেটোনিজম-এর সব সময়েই একটা প্রবণতা রয়েছে। আর তার প্রবণতা রয়েছে ভূমার দিকে। ঐহিক ভূমা সম্বন্ধে জনসন-এর ধর্মীয় সংশয় ছাড়া সাধারণতার মহিমাবিষয়ক তাঁর অনুবাদ ছিল অ্যারিস্টটলিয়ান শ্রেণীর সঙ্গে নিও-প্লেটোনিক বিস্তৃতির স্বার্থক সংযোগ।

(৬) একটি ভাব সর্বজনীন ও চিরকালীন হয় যদি তা উদ্দেশ্য ও গঠনের দিক থেকে নিখুঁত আদর্শকে উপস্থিত করে আর প্রদর্শন করে তাকেই যা সম্ভাব্যতা, পারদর্শিতা ও অস্ফুটতাকে পূর্ণ রূপ দিতে সক্ষম। একজন দার্শনিক অথবা একজন নিগূঢ় ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর বিপরীতের তুলনায় অনেক কম সাধারণ, তবে আর এক অর্থে একজন মানুষের চেয়েও তিনি অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ।

প্রকৃত কথা, সাহিত্যিক অত্যুৎকর্ষের পরম ও চিরন্তন মানের সাহিত্য যে-সব অধ্যায়ে রচিত হয় সেগুলিই প্রকৃত ক্লাসিক্যাল যুগ। তাই দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক ধারণায় নয়, ঐতিহাসিক প্রত্যয়ে উপলব্ধি করতে হবে ক্লাসিসিজমের অর্থ, যা গ্রীকসাহিত্যে অনুকৃত নন্দনতত্ত্বের দীর্ঘ প্রবাহের প্রতি নির্দেশ করে আর সংকেত করে যৌক্তিকভাবে প্রায়-অভিন্ন এক নোতুন ব্যাখ্যার প্রতি যে, পাশ্চাত্য নন্দনভাব ও সাহিত্যমনন আবর্তিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর 'হেলেনিস্টিক আলেকজান্দ্রিয়া' থেকে 'ফ্রেঞ্চিফাইড্ য়ুরোপ' পর্যন্ত এই দ্বিসহস্রব্যাপী ঐতিহ্যের গতিপথে। প্রাচীন গ্রীক ও বর্তমানদের বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমগ্র ইতিহাসকে এর অঙ্গীভূত করা হয়েছে, তবে তার মাঝে মধ্যযুগের ও স্পেন-ইংল্যাণ্ডের সপ্তদশ শতকের আংশিক ব্যতিক্রম রয়েছে। নির্দিষ্ট আদর্শের পূর্বে স্বয়ংসিদ্ধ এথেন্স ছিল প্রাক-ক্লাসিক ভাবধারায় নিষিক্ত; রোমান্টিসিজম সেই নির্দিষ্ট আদর্শকে ভেঙে স্বয়ংসিদ্ধতাকে পুনর্বার স্থাপন করে ক্লাসিকোত্তর যুগের সূচনা করে। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্লাসিক্যাল অধ্যায় ও মর্মস্পর্শীভাবে প্রত্যেকটি ক্লাসিক ভাবপ্রকাশকে যাচাই করতে হবে সাধারণ ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এর বিশেষ মর্যাদার দিক থেকে।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

বিচিত্রা : পূর্বানুবৃত্তি

তৃতীয় বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৩৬ — জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

আষাঢ় ১৩৩৬

বেদনার মূল্যে

একটি পত্রাংশ। "তোমার গভীর শোকে সান্ত্বনা দিতে পারি...

১৮ই ভাদ্র ১৩৩০

অপ্রকাশিত

স্বপ্নদূ

১৩২৬ চৈত্রসংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্রিত

শান্তিনিকেতন। ২য় সংস্করণ, ২ খণ্ড, পৃ ৬০১

শ্রাবণ ১৩৩৬

আহ্বান

'ওরে ঝড় নেবে আয়'

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

সীমার দুঃখ

১৩২৬ ফাল্গুনে সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্রিত

১১ই মাঘ উৎসবের উদ্বোধন ও উপদেশ

অপ্রকাশিত

ভাদ্র ১৩৩৬

সীমার সার্থকতা

১৩১৯ আশ্বিন সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে পুনরুদ্রিত

পথের সঞ্চয়

আশ্বিন ১৩৩৬

শারদোৎসব

১৩২৬ আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্রিত

চলিত ভাষায় রূপান্তরিত।

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, গ্রন্থপরিচয়ে পুনরুদ্রিত

স্বরলিপি

'কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে'

স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরবিতান ১

কার্তিক ১৩৩৬

কলাবিদ্যা

১৩২৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্ধৃত
চলিত ভাষায় রূপান্তরিত
অপ্রকাশিত

শিল্পের স্বাধীনতা

শ্রীঅসিতকুমার হালদারকে লিখিত পত্রাংশ 'নানা কথায়' মুদ্রিত
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯
অপ্রকাশিত

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

সীমা ও অসীমতা

১৩১৯ কার্তিক সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে পুনরুদ্ধৃত
পথের সঞ্চয়, ২৫ বৈশাখ ১৩৫৪

স্বরলিপি

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ১৩

পৌষ ১৩৩৬

নবজীবনের দীক্ষা

১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্ধৃত
৭ই পৌষের উপদেশ
অপ্রকাশিত

মাঘ ১৩৩৬

মনোবিকাশের ছন্দ

১৩২৬ আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্ধৃত
চলিত ভাষায় রূপান্তরিত
শিক্ষা, ১৩৪২ সংস্করণ

ফাল্গুন ১৩৩৬

বিশ্বভারতী

১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্ধৃত
বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের দিনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা

বিশ্বভারতী, ২ সংখ্যক প্রবন্ধ

পঞ্চাশোর্ধ্বম্

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশনের জন্য লিখিত অভিভাষণ।
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩। সাহিত্যের পথে, চৈত্র ১৩৬৫ সংস্করণ

চৈত্র ১৩৩৬

ভারত ইতিহাস-চর্চা

১৩২৬ চৈত্র সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্ধৃত

ইতিহাস

গৌড়ী রীতি

স্বাক্ষরহীন
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, গ্রন্থপরিচয়
পরিবর্তিত পাঠ, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৩৯
প্রহাসিনী

প্রবাসযাত্রীর পত্র

"প্রথম বয়সে অনেকদিন পৃথিবীর দিকে...
২ মার্চ ১৯৩০
অপ্রকাশিত
এই পত্র একটি নূতন গান 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' সংবলিত

বৈশাখ ১৩৩৭

নববর্ষ

অপ্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

কর্ম্মের স্থায়িত্ব

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের মৌখিক আলোচনার অনুলিখন
বিশ্বভারতী, ১৯ সংখ্যক প্রবন্ধ

চতুর্থ বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৩৭ — জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

আষাঢ় ১৩৩৭

স্ত্রী-স্বাধীনতা

নীলিমা দাসকে লিখিত পত্র। "তোমার চিঠির ঠিকমতো উত্তর দিতে ."
১৩ ডিসেম্বর ১৯২৯
অপ্রকাশিত

স্বরলিপি

'এসো এসো প্রাণের উৎসবে'
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ১

শ্রাবণ ১৩৩৭

পিতা নোঽসি

১৩২৬ পৌষ সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্ধৃত।
৩ অগ্রহায়ণ তারিখে মন্দিরে উপদেশ
অপ্রকাশিত

ভাদ্র ১৩৩৭

মানুষের পরিচয়

১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্ধৃত।
মন্দিরে উপদেশ, ১১ আষাঢ় ১৩২৬
অপ্রকাশিত

আশ্বিন ১৩৩৭

গান

'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়'

স্বরলিপি

'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়'

স্বরলিপি। হিমাংশুকুমার দত্ত

দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি,

স্বরবিতান ১৩

কার্তিক ১৩৩৭

বিদ্যার যাচাই

১৩২৬ আষাঢ় সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনরুদ্রিত

চলিত ভাষায় রূপান্তরিত

শিক্ষা, ১৩৫১ সংস্করণ

অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

বাঙালীর খাদ্য

১৩২৬ আষাঢ় সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রে প্রকাশিত 'খাদ্য চাই' এবং আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'আহারের অভ্যাস' প্রবন্ধদ্বয়ের একত্র পুনর্মুদ্রণ

পৌষ ১৩৩৭

আত্মার জাগরণ

১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত

৭ পৌষে প্রাতঃকালীন উৎসবের উপদেশ

অপ্রকাশিত

অনাদি কালের বার্তা

'পক্ষে বহিয়া'

হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। 'লিবার্টি'র সৌজন্যে প্রকাশিত

কবিতাটি পাঠ-পরিবর্তন সহ 'বাণী' নামে ১৩৩৭ মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত

অপ্রকাশিত।

মাঘ ১৩৩৭

জীবন-উৎসব

১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত

৭ পৌষ উপদেশ

অপ্রকাশিত

ফাল্গুন ১৩৩৭

আমি

পরিশেষ

স্বরলিপি

'মিলনরাতি পোহালো'

স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরবিতান ১

চৈত্র ১৩৩৭

বিদায়খনে

গান। 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কি মোহে'

সমালোচনার ধারা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্র। 'তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের'

২ মাঘ ১৩১৯

অপ্রকাশিত

আশীর্বচন

নিখিলবঙ্গ ছাত্র-সম্মেলনে প্রেরিত

'নানা কথা' বিভাগে উদ্ধৃত

অপ্রকাশিত

বৈশাখ ১৩৩৮

'একলা বসে হেরো তোমার ছবি'

গান। কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত

বিচিত্রার ক্রোড়পত্র।

বীথিকা। ছবি

রঙীন

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫।

পরিশেষ। সংযোজন

রূপদৃষ্টি

অপ্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

রেখার মায়াজাল

শ্রীমতী রানী মহলানবিশকে লিখিত দুইখানি পত্র। ১৮ কার্তিক ১৩৩৫, ও ২১ কার্তিক ১৩৩৫

পথে ও পথের প্রান্তে, পত্রসংখ্যা ২২ ও ২৩

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

আ লো চ না

ধর্মক্ষেত্রে

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ। তাতে কোন ক্ষতি নেই কারণ ধর্মনিরপেক্ষ অর্থ ধর্মহীন নয়। আর ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। ব্যক্তিগত ব্যাপারকে রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত করার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। যেমন সঙ্গত নয়—বেগুন ভাজা খাবেন না বেগুনে পোড়া খাবেন ব্যাপারটিতে রাষ্ট্রকে জড়ান। ধর্মকে পাইকারী ভাবে ব্যবহার করাব ফলে, ইতিহাস সাক্ষী জগতে বহুবার বহু অঘটন ঘটেছে। অথচ বেগুনে পোড়া ভাজার চেয়ে উৎকৃষ্ট অতএব সকলকে পোড়া খেতেই হবে এই বলে পোড়ারদল কখন নিজেদের ভাজার দলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে 'এস তোমাদের কোতাল করা যাক' বলে অস্ত্রধারণ করেনি।

মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক কোনদিন থেকে ঈশ্বর এসেছে বলা না গেলেও বহু দিন থেকেই তিনটি চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। একদল বলছে ঈশ্বর আছেন, একদল বলছে ঈশ্বর নেই, তৃতীয়দল বলছে ঈশ্বর আছেন কি নেই জানা যায়নি প্রমাণ সমেত। প্রথম দল ঈশ্বরবাদী, দ্বিতীয় দল নিরীশ্বরবাদী, তৃতীয় দল অজ্ঞেয়বাদী। যদিও নিচের দিকে গড়িয়ে চলা জলের ধর্ম, আকাশে উড়ে যাওয়া ধোঁয়ার ধর্ম, হামাগুড়ি দেওয়া শিশুর ধর্ম তবু ধর্ম কথাটির অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে। আর তা ঈশ্বর যেমন এক, ধর্মও তেমনি এক সেভাবে মেশেনি। মিশেছে ঈশ্বর আছেন এবং তাকে লাভ করা যায়, উপায় হল ধর্ম এবং আমাদের ধর্ম। আমাদের, তোমাদের তাদের করে নানা ধর্মমত, লক্ষ্যও এক তবু পরস্পরে মেলেনি। শুধু মেলেনি নয় প্রত্যক্ষত ভেদ অর্থাৎ অমিল ঘটেছে। যত মত তত পথ—এ স্বীকৃতিটুকুর সহনশীলতার পর্যন্ত অভাব ঘটেছে তার আত্যন্তিক আবশ্যকতা সত্ত্বেও। অথচ প্রতিটি ধর্মমত কাগজে কলমে সুন্দর এবং মানুষকে উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে নেবার সম্ভাবনা সূচিত করে।

ধর্ম নিয়ে অশান্তি ঘটেছে বলে নিরীশ্বরবাদী তথা নাস্তিকরা এই অজ্ঞেয়বাদীরা সুযোগ নিতে ছাড়েননি। তাঁরা বলেছেন ঈশ্বর বা ধর্ম একশ্রেণীর স্বার্থপরের অবলম্বন তাদের স্বার্থ সিদ্ধির উপায়। ক গান করতে জানেনা কারণ তার রং কালো এমন একটা যুক্তির প্রতিবাদ করার প্রয়োজন যেমন কোন কালো সুগায়ক অনুভব করেন না তেমনি কোন ঈশ্বরবাদী তথা আস্তিক একথা বলার প্রয়োজন নাও বোধ করতে পারেন যে স্বার্থসিদ্ধিই যার মুখ্য সে আর দশটা উপায়ের সঙ্গে ধর্মের ভেকটা নিতে পারে।

বর্তমান কালের অন্যতম চিন্তাশীল অজ্ঞেয়বাদী বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে জগতে ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই কেবল আছে পরিণাম—কনসিকোয়েন্সেজ। যেমন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর, আগুন লেগে পোড়া, খেলে ক্ষুন্নিবৃত্তি, আছাড় খেলে আঘাত তেমনি প্রতি ক্ষেত্রেই এই কার্যকারণ মিশ্রিত পরিণাম। একটির ফলে অন্যটি ঘটে, এক রূপ রূপান্তরিত হয়, অবস্থা থেকে ঘটে অবস্থান্তর। তাই রাসেলের মতে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি অপ্রয়োজনীয়। তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে বাস করতে হলে এবং পরকে বাস করতে দিতে হলে কিছু একটার প্রয়োজন তিনিও অনুভব করেন। তাই তিনি বিধি দিচ্ছেন জ্ঞান ও প্রীতি অনুশীলনের। মানুষের জ্ঞান যত

বাড়বে এবং পরস্পরে প্রীতি যত বাড়বে তত জগতটা বাসোপযোগী হবে এই তাঁর ধারনা। নলেজ ও লভ্ এ দুটি বাড়ার তিনি পক্ষে।

নিজের দলের লোক বাড়ানোর চেষ্টা ঈশ্বরবাদীদের ধর্ম একথা নাস্তিকরা বলে থাকেন। বৈষ্ণব, শৈব, খৃষ্টান ইত্যাদি আগে মানুষ পরে আস্তিক। মানুষেরই ধর্ম হল জোট বাঁধা—নিজের দল ভারী করা। রাসেল অজ্ঞেয়বাদী তবে মানুষ এবং তিনি জ্ঞানী একথা সবাই মানে। তাই দেখা যাচ্ছে মানুষের ধর্মকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না; জগতে জ্ঞানী লোক বাড়ুক এই ইচ্ছার সঙ্গে নিজের দল ভারী করার কোন সজ্ঞান প্রচেষ্টা হয়ত নাও থাকতে পারে তবু তাঁর বক্তব্যের এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এমন নয়।

অস্ত্রোপচার কালে রোগীর যাতে কোন রকম কষ্ট না হয় আধুনিক শল্যচিকিৎসার সেটি লক্ষ্য। অপরাধীর শাস্তিবিধানের অযৌক্তিকতা সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। রোগীকে চিকিৎসার মত মমত্ব নিয়ে তিনি অপরাধীকে সংশোধিত করার পক্ষপাতী। এমন মানব প্রেমিকের অবশ্য ধর্মহীন হলেও চলে কিন্তু মনুষ্যসমাজে ঈশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, অজ্ঞেয়বাদী নির্বিশেষে এমন মমত্ববোধ বিশিষ্ট মানুষ 'কোটিকে গুটিকই বা মিলল কই।

কলকাতা সহরে সকলে জানেন মাঝে মাঝে ফ্রী স্টাইল কুস্তি প্রদর্শিত হয়। প্রবেশ-মূল্য অল্প নয়; তাও প্রনর্শনীর সময় সেখানে প্রচুর জনসমাগম ঘটে, প্রতি খেলাধূলা কতক-গুলি নিয়মে বদ্ধ। সেগুলি মেনে চলার ফলে খেলার আকর্ষণ বাড়ে। সমস্ত শরীর ব্যবহার করতে পারলেও ফুটবল খেলায় হাত ব্যবহার করা চলে না, করলে নিয়মভঙ্গ হয়। সে কারণেই খেলাটির উপভোগ্যতা বাড়ে। কিন্তু এই ফ্রিস্টাইল কুস্তির নিয়ম এত শ্লথ যে ব্যাপারটি প্রায় এক অমানুষিক মারামারির পর্যায়ে পশে। শোনা যায় এ খেলায় শুধু প্রতিপক্ষকে যথেচ্ছ কিল চড় ঘুষি লাথি নয় চুল অথবা দাড়ির মুঠি ধরে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয় এমনকি মাথায় সজোরে আঘাত করার ফলে দরদরধারে রক্তক্ষরণের দৃশ্যও বিরল নয়। এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন নাকি সহস্র সহস্র দর্শকের উল্লাসধ্বনি ক্রীড়া-প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে তোলে। এটা বিংশ শতাব্দী। বাজারে বা ঐ ধরনের প্রকাশ্যস্থানে বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে গিলোটিন, ফাঁসি বা অপরাধীকে চাবুক মেরে রক্তারক্তির দৃশ্য পূর্বে অনেক দর্শকের উল্লাস ঘটিয়েছে। জগত তখন এতটা সভ্য (?) সভ্য হয়নি। এইসব ঘটনার অংশগ্রহণকারী, উদ্যোক্তা এবং দর্শকবৃন্দের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদ ধর্মভেদ নেই। ধর্ম নির্বিশেষে এসব দৃশ্য লোকে উপভোগ করেছে, এখনও করছে। মেয়েরা মাছ কোটায় পুরুষদের চেয়ে নিপুণ হলেও তাদের কোমলপ্রাণা মনে করা হয়। কোমলপ্রাণারা ফ্রিস্টাইল কুস্তি অত্যন্ত উপভোগ করেন। কোন্ পৈশাচিকতা ভালনের খাতিরে লোকে এসব ঘটনায় বেদনাবোধ না করে উল্লসিত হয় সেটা বোঝা যায় মতের ধর্মে নয়, মানুষের ধর্মে নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা, রক্তলোলুপতা ইত্যাদি নিহিত আছে। ধর্মমতগুলি হয়ত মানুষের এসব ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টায় গড়ে উঠে থাকবে কিন্তু বিফল হয়েছে। তার মানে এ নয় যে ধর্মমত মানুষকে অমানুষ গড়ার চেষ্টায় গড়ে উঠেছে।

হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ, মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ, খৃষ্টানে খৃষ্টানে যুদ্ধ ত রাজায় রাজায় যুদ্ধের মত কম হয়নি। অথচ হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা কিংবা মুসলমানে খৃষ্টানে হাঙ্গামা হলে ধার্মিক হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান লজ্জা পেয়েছেন এই ভেবে যে ধর্মহীনেরা এর প্রতি কটাক্ষপাত করবেনই র‍্যাশনালিটির চর্চা কারো একচেটে নয়—বার্ট্রান্ড রাসেল হলেও নয়। তবে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে মানুষের ধর্ম যত্নপ্রধান প্রবৃত্তিকে স্বীকার না করে কেন ধর্মা-চরণকারীদের বিশ্বাসে অহেতুক আঘাতের কুযুক্তি প্রয়োগ? তার কারণ কেউই ষোল আনা

র‍্যাশনাল অর্থাৎ যুক্তিনিষ্ঠ নয়। হানাহানিতে নেমে পড়া, ভিড়ে যাওয়া রয়ে গেছে মানুষের রক্তে, সুযোগ পেলেই সে তাতে নামে। সুযোগ না পেলেও ছাড়েনা; তখন গিলোটিন দেখে, ফ্রিস্টাইল কুস্তি দেখে আর (শব) স্বপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। যীশু তো বলেছেন ডান গালে চড় খেয়ে বাঁ গাল বাড়াও, চৈতন্য তো বললেন, কলসীর কানা মারলেও প্রেম দেব কিন্তু সেসব কথা কজন খ্রীষ্টান শুনল, কজন বৈষ্ণব শুনল। কজন মানুষ শুনল? নইলে আস্তিক রাষ্ট্র আমেরিকা এবং নাস্তিক রাষ্ট্র রাশিয়া কি ভলিবল খেলবার জন্যে এটমবোমা নির্মাণে রত?

এই নিবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদের যে জায়গায় কালো রংএর উল্লেখ আছে সে জায়গাটি পড়তে গিয়ে কোন সুস্থ ব্যক্তির হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু আজকের দিনে এই পৃথিবীতে সভ্য বলে পরিচিত দেশে কৃষ্ণকায় ব্যক্তি যদি সৌজন্যবশে কোন শ্বেতাঙ্গ রমণীকে বাসে নিজের জায়গা ছেড়ে দেন তাহলে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে ভর্ৎসিত হন কৃষ্ণকায়। যার উল্লেখমাত্র এদেশে হাসাকর দেশান্তরে সেই বর্ণবৈষম্যে গুণের তারতম্য নির্ধারিত হচ্ছে। এবং বিষয়টি সারা বিশ্বের চিন্তাশীলদের কাছে একটা সমাধানহীন সমস্যা। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কাণ্ড ঘটল তাকে অনেকের জালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়েছে। এই অত্যাচারের কারণগুলির মধ্যে বর্ণগত আধিপত্য অন্যতম।

ধর্ম প্রচারকেরা যেমন বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার করে আসছেন নাস্তিকেরাও তেমনি ধর্মের অসারতা, অপ্রয়োজনীয়তা এবং ধর্মান্ধদের স্বার্থদুষ্ট অভিসন্ধির কথা প্রচার করে আসছেন। তাঁরা ধর্ম মানেন না বলে নিষ্ক্রিয় নন প্রকারান্তরে নাস্তিকের দলবৃদ্ধিতে তাঁরা সচেষ্ট এবং উৎসাহী। চার্বাক সম্প্রদায়ের কথা সকলেই জানেন, নাস্তিক্যবাদ তাঁদের প্রচার্যবিষয়। নিজে ধর্ম তথা ঈশ্বর মানেন না ফুঁয়ে উড়িয়ে গেল—এ ভাব তাঁদের নয়। মানুষের সংশয়তার সুযোগে সে সংশয়কে অবিশ্বাসে পরিণত করার জন্য তাঁরা বহু চেষ্টা করেছেন সে সব প্রচারের মধ্যে যুক্তি আছে যদিও উত্তর পক্ষ এই পূর্ব পক্ষের যুক্তির প্রতিযুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু একথাটি থেকেই যায় যে যা নেই বলে নাস্তিক মনে করেন তেমনি একটি বিষয়ের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বুদ্ধি, শক্তি, উদ্যম নিয়োজিত করেছেন এবং একেবারে যে বিফল হয়েছেন একথা বলা চলে না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর অনেক জীবনীকার নাস্তিক বলেছেন। কারণ ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কেউ কখন কোন কথা তাঁর মুখে শোনেনি। আবার নাস্তিক্য প্রচারকের ভূমিকাতেও কখন তাঁকে দেখা যায় নি। সুতরাং তিনি ধর্মহীন ছিলেন কি নাস্তিক ছিলেন কি ধার্মিকের কাছে ধর্ম যেমন ব্যক্তিগত আচরণীয় গুপ্ত বিষয় সেভাবে ধর্মাচরণ করতেন তা জানা যায় না, তবে একথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যায় যে বিদ্যাসাগরের মত নাস্তিক যদি কোন জাতির ইতিহাসে শতাব্দীতে একটি করেও আবির্ভূত হন তাহলে সে জাতি ধন্য। কারণ আস্তিক্য বা নাস্তিক্য আধামানুষের জন্য। বিদ্যাসাগর মানুষ ছিলেন।

—তাই মনে হয় বিদ্যাসাগর, বার্ট্রান্ড রাসেল, বিবেকানন্দ এঁরা সব এক ভিন্ন জাতের মানুষ। ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের মত যাই হোক মানুষের সম্পর্কে তাঁদের মত ঠিক আছে; একই আছে। তা হল মানুষকে কষ্ট দেওয়া নয়। কষ্ট দেবার জন্য ছলের অভাব হয় না—শাসক শাসিত হোক বিজয়ী বিজেতা হোক সাদা কালো হোক হিন্দু হিন্দু হোক হিন্দু মুসলমান হোক হিন্দু খ্রীষ্টান হোক এদেশে ওদেশে হোক এপারে ওপারে হোক এবাড়ী ওবাড়ী হোক ভাই ভাই হোক শাশুড়ী বৌ হোক—একটা বেধে গেলেই হল। বাধবার পরই বোঝা যায় একপক্ষ প্রবল আর এক পক্ষ দুর্বল, তখন প্রবল দুর্বলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রকৃতিকে মানুষ জয় করার চেষ্টা করছে অনেকদিন থেকেই এবং তা বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান হিসেবে পরিচিত। কিন্তু

মানুষ মানুষের যত ক্ষতি করেছে প্রকৃতি কি তার ধারে কাছে যেতে পারে! বাঘে আর কটা মানুষ মেরেছে সেত মানুষের রক্ত খেতে ভালবাসে; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পর্যন্ত মানুষ যত মানুষ মেরেছে তার মধ্যে একবার মাত্র ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করেছিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়েছিল বটে খেতে যে খুব ভাল লেগেছিল এমন কথা কোথাও পাওয়া যায় নি।

এইবার মানুষকে ধরে একবার জিজ্ঞেস করুন, তুমি ত রক্ত খাওনা তবে এতদিন ধরে এত মানুষ মারলে কেন? দেখবেন কোন উত্তর নেই।

শঙ্কর গুপ্ত

কোন আদিকাল হতে

আমাদের এই যে জীবন একী শুধু আমাদেরই হাসিকান্নায় ভরা কয়েকটা বছর—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—তার পর? তারপর কি কিছুই নেই। অনন্ত শূন্য থেকে আবার অনন্ত শূন্যে। অত্যন্ত বাস্তব জীবনের কটা দিনের আগে পিছনে কি আর কোথাও কোন কিছু নেই। এই জীবনব্যাপী সাধনা, আশাআকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখের সমস্যা এর কি কোন যোগাযোগ নেই এতবড় জীবনের সঙ্গে। এ প্রশ্ন মনে ওঠে। জীবন বলতে তো শুধু আমার বেঁচে থাকা কটা দিনমাত্রই নয়, প্রাণের যে অবাধ গতি চলেছে চতুর্দিকে, প্রকৃতির মধ্যে, প্রাণীর মধ্যে, মানুষের মধ্যে তার সমস্ত লীলাটাই তো জীবন। সেই বৃহৎ বিশ্বের, সুদূর কালের পটভূমিকায় জীবনের রূপ সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

যে জীবনটুকু ভোগ করছি এ আর কতটুকু—কিন্তুই সত্যিই কি এর ব্যাপ্তি এখানেই শেষ। রবীন্দ্রনাথ এর অন্য অর্থ করেছেন। জীবন চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে, তার বিরাট প্রবাহে আমরা তরঙ্গের মত, উঠি আর মিলিয়ে যাই। যতদিন থেকে প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণের শিহরণ ততদিন থেকেই জীবন চলছে। সৃষ্টির এই সুদীর্ঘকালের লীলার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনরহস্যের অপূর্ব সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর বহু কবিতায় ও গানে, প্রবন্ধে এই জীবনরহস্যের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। তাঁর জীবনে সুদীর্ঘ ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসে এই কথাটি একটি অস্ফুট ইঙ্গিত থেকে একটি গভীর উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে। পরিণত সেই চিন্তার তত্ত্বটি তাঁকে বুঝতে সাহায্য করবে।

সংসারে আমরা কেউই আকস্মিক নই, ভুঁইফোড় নই। আমাদের জন্মের কারণ আছে, পুত্র মাত্রেরই পিতা আছেন। বিনা অনুসন্ধানেই নিঃসংকোচে বলা চলে যে পিতারও পিতা আছে—তাঁরও পিতা আছে। কল্পনাকে যদি ক্রমাগত দূর হতে দূরতর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে মানবের আদি পিতাও স্বয়ম্ভু নন। ডারুইন তত্ত্ব না জেনেও বলতে পারা যেত যেআদি মানবেরও পিতা ছিল তার রূপ যতই অমানবীয় হোক না কেন। সে কোন প্রাণীর রূপ হতে পারে, যে প্রাণী আরও যুগ-যুগান্তর আগে হয়তো ছিল তৃণ, হয়তো তরু, হয়তো বিলীন ছিল মাটির জঠরে। এই যে জীবনের ধারা যার সুরু জানা নেই আমরা সেই ধারার অঙ্গ, সেই স্রোতের তরঙ্গ। ছিন্নপত্রের কবি বলছেন

"একসময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠতো, শরতের আলো পড়তো, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক

রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকতো, আমি কত দূরদূরান্তর দেশ-দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য-সনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেলগাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।"

এ অবস্থা সৃষ্টির আদিকালের অবস্থা, তখনও তার শ্যামল অঙ্গের রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে; সদ্যজাত পৃথিবীর বুকের ভিতর তখন একটি আনন্দ-রসের স্রোত জেগেছে তারই ফলে সে মাটির মধ্যে, হয়তো বা পঞ্চভূতের মধ্যে আমাদের প্রাণের উৎস ছিল। যে চেতনার প্রবাহ আজ আমাদের জীবনকে পরিচালিত করছে সেই চেতনা ছিল ঘাসে এবং গাছের শিরায়। সংবেদনশীল মন অনুভব করতে পারে সেই আদিম পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রের রোমাঞ্চ, নারকেলগাছের পাতার কম্পনের সঙ্গে আজকের আবেগাহ্বল মানব হৃদয়ের উৎকণ্ঠার যোগ নেই একথা কে বলতে পারে। ছিন্নপত্রের আরও একটি চিঠিতে প্রকৃতির সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সেই আদিকালের ঘনিষ্ঠতার কথা কবি বলেছেন। শুধু আদি মানব নয়, কোন বিশেষরূপে প্রকাশিত প্রাণ নয়, জড় পৃথিবীর সঙ্গেই একদিন সমস্ত প্রাণ লীন হয়ে ছিল। সেই দিনের কথা কবির কল্পনায় ভেসে ওঠে ভাবনায় ফুটে ওঠে তার ছবি।

"বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন,—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম—নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে মস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তনরস পান করেছিলেম।"

আজও কবির চেতনার মধ্যে সেই অতীত পরিচয়ের অস্পষ্ট আভাস ভেসে আসে কোন দূরাগত ধ্বনির ঝংকারের মতো, কোন বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মতো। এই কথাই ছন্দের সুরে বেঁধেছেন সমুদ্রের প্রতি 'বসুন্ধরা' 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়। জীবনধারার এই অবারিত প্রবাহ কোন বুদ্ধিগত তত্ত্ব নয়, এ তাঁর উপলব্ধি থেকে জন্ম নিয়েছে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ কবি লিখলেন অহল্যার প্রতি। এই কবিতায় যে অহল্যা শাপমুক্ত হয়ে জেগে উঠেছে সে ছিল মাটির সঙ্গে বিলীন। তাকে কবি প্রশ্ন করেছেন, মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে কি জানতে পেরেছে পৃথিবীর মহাস্পন্দে—

জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা
মাতৃধৈর্যে মৌনমুখ স্তব্ধদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা মাঝে?

পাষাণী অহল্যার বক্ষে জীবধাত্রী জননীর বেদনা স্পন্দন বেজেছিল কিনা এই হলো কবির প্রশ্ন।

অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের নিগূঢ় যোগ দেখিয়েছেন এবং ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গে

তিনি বলেছেন যে আমাদের মনুষ্যত্বের যে বোধ আমাদের বিরাট বিশাল পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সে বোধ 'সংস্কার মাত্র নয়, সে পূর্ণ সচেতন বোধ। প্রকৃতিরাজ্যে এ বোধের স্থান নাই।'

মানুষমাত্রেরই মনে হাজার হাজার সংস্কার ছড়ানো আছে। যারা সাধারণ তাদের সচেতন সংস্কারগুলো তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে যারা অসাধারণ তাদের অবচেতনে জেগে ওঠে যে সব সংস্কার তার প্রভাব শুধু তাদের জীবনে নয় দূরবর্তী কালে ও অন্যান্য জীবনেও বিস্তৃত। জীবনের এই অখণ্ড দেশকালব্যাপী বিরাট রূপ রবীন্দ্রনাথের কোন সংস্কারকে জাগ্রত করেছিল যার ফলে তাঁর এই সম্যকদৃষ্টির উদ্বোধ সম্ভব হল, প্রতিভার সে গূঢ় তত্ত্ব আমাদের জানা নেই।

চেতনার এই অনাদিঅনন্তকালের প্রবাহ যা আমাদের মধ্য দিয়ে চলেছে তার সম্বন্ধে আমাদের বোধ জেগে ওঠে যখন তখনই বুঝি আমাদের জীবন বিচ্ছিন্ন নয় এটা একটা দুর্ঘটনা নয়। ডারুইন, ফেকনার, বার্গসঁ প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে কবির এই গূঢ় অনুভূতির নিকট যোগ দেখিয়েছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

সৌরজগতে পৃথিবীর যে উন্মাদ নর্তন তার সঙ্গে কি আমাদের যোগ নেই! যেদিন এই পৃথিবীর ধূলিকণার মধ্যে আজকের আমি লুকিয়ে ছিলাম, সেদিন অবিশ্রান্ত ছন্দের যে গতি ছিল তার সূর্যমণ্ডলে, তার স্মৃতি ও কবির ধ্যানে আসে

তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরে আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাণী
পত্র ফুলফল গন্ধরেণু।

'অহল্যার প্রতিতে যা প্রশ্ন 'বসুন্ধরা'য় তা ঘটনা যা সহজে মনে পড়ে, যার সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নেই। 'সমুদ্রের প্রতি' আরও এক পা এগিয়ে গেল। এ সমুদ্র পৃথিবীর জননী। এর ভুবন ভ্রূণের মধ্যে ছিল প্রাণ যে অনুভব করে তার চতুর্দিকে তরঙ্গের দোলা। এখানে কবি সবেগে বলছেন 'নাড়ী'তে যে রক্ত বহে সেও যেন ঐ ভাষা জানে আর কিছু শেখে নাই।" এ প্রশ্ন নয়, এ স্মৃতি নয় এ বর্তমানের ঘোষণা।

ভালবাসার গৌরব ঘোষণা করতে আমরা বলেছি প্রেম জন্মান্তরের। কত নায়ক তার নায়িকাকে বলেছে যে তাদের প্রেম গত জন্মের এবং পর জন্মেও তার ক্ষয় নেই। যে ভালবাসার ব্যাপ্তি নেই তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ভালবাসার সেই দিগন্তপ্রসারী বিস্তারের স্পর্শ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন ঐ অনাদি চেতনার তত্ত্ব দিয়েই

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী

মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিয়ে যে ভাবখানি।
এই প্রাণেভরা মাটির ভিতরে
কতযুগ মোরা পেয়েছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

এমনি করে ভালোবাসা ছড়িয়ে গেল কোন দূর যুগে, যেখানে প্রাণে ভরা মাটির মধ্যে দুজনের নিত্য মিলন ছিল।

এই যে ধারণা এ শুধু কবির উচ্ছ্বাস নয়, কল্পনা নয়, এ তাঁর গভীর বিশ্বাস। ষ্টপফোর্ড ব্রুক কবিকে এ প্রশ্ন করেছিলেন যে জন্মান্তর তিনি মানেন কিনা। তার উত্তরে কবি বলেছিলেন "আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিষ।"

চেতনার ও জীবনের এই পূর্ণতা, যা সৃষ্টির আদি থেকে কোন অজানার উদ্দেশ্যে একটি অখণ্ড ধারায় চলেছে তারই কথা কবি গানে বললেন

জানি জানি কোন আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।

সোমেন বসু

কাব্য সমালোচনার কথা

ঐতিহাসিকের কাজ আর সমালোচকের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যেমনটি ঘটেছিলো তেমনটি বর্ণনা করাই ঐতিহাসিকের কাজ। আর, সমালোচকের কাজ হচ্ছে, যেটা আছে, বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে তার সম্যক আলোচনা করা। কিন্তু একটা বিষয়ে ঐতিহাসিক এবং সমালোচকের মধ্যে মিল আছে। ঐতিহাসিক এবং সমালোচক এই দুজনের কেউই তাঁদের আলোচনার ওপর শেষ কথা বলতে পারেন না। কারণ, প্রত্যেক যুগে ইতিহাসের পুনর্লিখন হয়। এবং সমালোচনার ক্ষেত্রেও যুগে যুগে প্রাচীনের পুনর্বিবেচনা করা হয়। একই গ্রন্থের সমালোচনা ভিন্ন যুগে ভিন্ন রূপ হয়। একই গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচকেরা বারেবারে নতুন করে নতুন কথা বলেন। আর এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, প্রত্যেক সমালোচকের দৃষ্টিভংগীতে তাঁর বিশেষ যুগের বিশেষ পরিবেশের প্রভাব থাকে। বিভিন্ন যুগের সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁদের আলোচনায় আসে বৈচিত্র্য।

কাব্য-সমালোচনার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক কাব্য-সমালোচককে সেই বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী চলতে হয়-ই। অ-সমালোচকের কাছে কথাটা অদ্ভুত ধরণের মনে হতে পারে। তিনি মনে করতে পারেন যে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে যদি সব সমালোচককে চলতে হয় তবে সবার রায়-ই তো একরকমের হবে। এ ভাবনাটা কিন্তু ঠিক নয়। সমালোচনার

প্রাথমিক পদ্ধতি একরকম বটে। কিন্তু সমালোচনার শেষ কথাটি আসে সমালোচকের অন্তর থেকে। প্রত্যেক মানুষ প্রথম অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকে; তারপর বুক-পিছল দেয়; তারপর হামাগুড়ি; সর্বশেষে চলন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কতকগুলো নির্দিষ্ট অবস্থা অতিক্রম করার পরে মানুষ চলতে শেখে। অর্থাৎ চলবার প্রাথমিক পদ্ধতিটা সবার ক্ষেত্রে-ই একরকম। কিন্তু উল্লেখযোগ্য, চলনের ভংগী ভিন্ন-জনের ভিন্ন-রূপ। প্রত্যেকের চলন-ভংগীর বৈশিষ্ট্য আছে। ঠিক তেমনি, সমালোচনার প্রাথমিক স্তরগুলো নির্দিষ্ট হলেও তার শেষ সিদ্ধান্ত জাগে সমালোচকের নিজের মনের সুর, নিজের মনের রঙ। এই কারণেই একজনের সমালোচনার সংগে অন্যজনের সমালোচনার মিল থাকে না। এই অ-মিল সমালোচকের ত্রুটীর পরিচয় নয়। এটা সমালোচকের স্বকীয়তার পরিচায়ক। এইখানেই সমালোচনার চমৎকারিতা।

সমালোচকের নিজস্ব মতামত গঠিত হবার আগে সমালোচককে যেসব প্রাথমিক নিয়ম-কানুন অনুসারে অগ্রসর হতে হয় সেগুলি সম্বন্ধে সমালোচনা ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তির ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে সমালোচকের কাজ দ্বি-মুখী। প্রথমত, আলোচ্য কাব্য বা কবিতার বিষয়বস্তু কি; এবং উক্ত বিষয়বস্তুর প্রতি কবির মনোভাব অর্থাৎ কবি কী বলতে চান্ সেবিষয়ে পাঠককে খবর দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমালোচকের কাছে ঐ বিষয়বস্তুর মূল্য কতোখানি। এবং কবি উক্ত বিষয়বস্তুর রূপায়ণে কতোটা সার্থক হয়েছেন তা পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে।

সমালোচকেরা সাহিত্য-প্রিয় এবং সত্যানুসন্ধিৎসু হন। তাঁরা স্বাভাবিক জ্ঞান (কমন্ সেন্স) এবং কল্পনাশক্তির সহায়তায় বিশেষ লক্ষ্য অনুসরণে আগুয়ান হন। সুতরাং সমালোচকের পক্ষে ধৈর্য এবং স্বাধীনতা অবলম্বন বিশেষ কর্তব্য। কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগে আলোচ্য বিষয়টি বারবার পড়ে দেখা উচিত। আলোচ্য বিষয়টি নিদেন পক্ষে তিনবার সযত্নে পড়বার পর প্রাথমিক মত নেওয়া যেতে পারে। আর, পড়বার রীতিটি সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে যে প্রথমে কাব্য বা কবিতার প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অংশ লক্ষ্য-করতে হবে; তারপর তার সামগ্রিক রূপের ওপর সন্ধানী দৃষ্টি মেলতে হবে; তারপর রায় দেওয়া চলবে। কবিতার সবটুকু ভালো করে না পড়ে, না বুঝে মতামত গঠন করা অনুচিত। সমালোচকের কাজ ভারী গুরুত্বপূর্ণ। সমালোচনার মধ্যে সমালোচকের ব্যক্তি-মনের ছাপ পড়া স্বাভাবিক। এবং তা প্রয়োজনীয় ও। ব্যক্তিগত ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার কথা যে—সমালোচক এড়িয়ে যান, তিনি নিশ্চয় নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর, নিজের সমালোচন-শক্তির ওপর আস্থাবান নন্। তবে সমালোচকের এই ব্যক্তিগত ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার কথা বলবার বাধাহীন অধিকার থাকার মানে এই নয় যে তিনি তাঁর ইচ্ছামতো আলোচ্য বিষয়ের প্রশংসা অথবা নিন্দা করতে পারেন। প্রকৃত কথাটা হচ্ছে, সমালোচককে প্রতিটী মতামতের সংগে যুক্তি দিয়ে তাঁর মতামতের প্রামাণিকতা বুঝিয়ে দিতে হবে। নিছক ব্যক্তিগত, অথবা রাজনৈতিক ইত্যাদি-রূপ মতামত দেওয়ার অধিকার সমালোচকের নেই। কেবলমাত্র সৌন্দর্যের নিরিখেই তিনি বিচার করবার অধিকারী। সেই জন্যেই বলি, সমালোচকের প্রথম কর্তব্য, কবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া। লেখকের মনের খবর সংগ্রহে কবির আগ্রহ অবশ্য-প্রয়োজনীয়। কবিতায় কবি যা বলেছেন, এবং যা বলতে চেয়েছেন—সেই দুটি দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতার সার্থকতা অসার্থকতা বিচার করতে হয়। এক্ষেত্রে, সমালোচকের নিজের দৃষ্টির আধিপত্য বর্জনীয়। লেখকের দৃষ্টি অনুসরণ করেই লেখকের সৃষ্টির সার্থকতা অসার্থকতা বিচার করা প্রয়োজন। সেইজন্যে, কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টির সংগে সহানুভূতি সম্পন্ন

হৃদয় না থাকলে সমালোচনা করা যায়না। কবির প্রতি দরদ না থাকলে কাব্যের দোষ-ত্রুটীর দিকটাই সমালোচকের চোখে বেশি করে ধরা পড়ে। ফলে দোষ-ত্রুটীর তালিকা অকারণে বৃদ্ধি পায়।

সমালোচকের কার্যক্রম নির্দেশ করতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, সমালোচককে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। প্রথমে কবিতা পড়বার সময়ে যে-সব শব্দ (ওয়ার্ড) বা বচন (ফ্রেজ) হঠাৎ কানে লাগবে—ভালো বা মন্দ হিসেবে—সেগুলি 'নোট' করতে হবে। এবং সেই সংগে সংক্ষেপে লিখে রাখতে হবে সমালোচকের ভালো বা মন্দ লাগার কারণ, অর্থাৎ সে বিষয়ে সমালোচকের সবটুকু বক্তব্য। পুংখানুপুংখ সমালোচনার এই প্রাথমিক অবস্থায় কোনক্রমেই তাড়াহুড়ো করতে নেই। সমগ্রস-বোধ ঠিক রাখতে হয়। এসময়ে পূর্বসংস্কার বা পক্ষপাতিত্বের বশবর্তী হওয়াও অন্যায়। এইজন্যেই সমালোচকের নিখুঁত অনুপাত-ধ্যানের দরকার। কারণ, সমালোচকের পক্ষে বেশি কথা বলা অপ্রাসংগিক, কম কথা বলা হানিকর। ভালো সমালোচকেরা ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু পরিষ্কার করে মতামত প্রকাশ করেন। বেশিও বলেন না। কম-ও বলেন না।

রচনার রীতি বিচারের সহজ পথ হচ্ছে,—কবি যা বলতে চান তা যে-ভাবে প্রকাশ করেছেন সেটা ঠিক উপযুক্ত হয়েছে কি-না তা লক্ষ্য করা। এইখানে আসছে প্রসংগ এবং প্রযুক্তির সামঞ্জস্যের কথাটি। 'প্রসংগ' অর্থে কবিতার বিষয়বস্তুকে বোঝায়। এবং 'প্রযুক্তি' অর্থে কবিতার কারুকার্য কৌশলকে বোঝায়। কবিতার কারুকার্য করা হয় শব্দ, ছন্দ, এবং অলংকারাদির প্রয়োগে। কাব্যজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন যে কবিতার দুটি দিক,—সুর এবং ছবি। তাই-তো কবিতা হয় দু'ধরণের,—সংগীতধর্মী, ও চিত্রধর্মী। সংগীতধর্মী কবিতায় থাকে ছন্দের প্রাধান্য। এবং চিত্রধর্মী কবিতায় থাকে অলংকারের প্রাধান্য। আর, ছন্দ এবং অলংকার—এই দুই-এরই মূলে আছে শব্দ প্রয়োগের বিশেষ কৌশল। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, রচনার রীতি বিচারের প্রথম কথা হলো কবির ইঙ্গিত বিষয় বা প্রসংগের সার্থক প্রকাশের পক্ষে সবচেয়ে সুষ্ঠু শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে কি-না তা দেখা।

মিল্টন কবিতার সম্বন্ধে যে মতের পরিপোষকতা করতেন (Poetry should be simple, sensuous and passionate.—Milton.) তার থেকে বোঝা যায় তিনি পাঠকের মনে কবিতার অব্যবহিত বা আশুপ্রভাবের, এবং আবেগ সঞ্চারের পক্ষপাতী ছিলেন। সোজা কথায়, মিল্টন চিত্রধর্মী কবিতার পক্ষপাতিত্ব করতেন। পরিমিততা এবং ইন্দ্রিয়গোচরতা ভালো চিত্রের আবশ্যিক গুণ। চিত্রণ-দক্ষতার গুণে কবিতা পাঠকের ইন্দ্রিয় গোচর হয়ে ওঠে। চিত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক্। তদনুযায়ী চিত্রের সাহায্যে পাঁচ রকমের গুণে-ই প্রকাশ করা সম্ভব। গুণগুলি হচ্ছে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ কবিদের চিত্রবিষয়ে পক্ষপাতিত্ব থাকে। প্রায় প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক রকমের বিশেষ চিত্রের ওপর খুব ঝোঁক থাকে। আবার অনেকসময়ে দেখা যায় জীবনের এক-এক সময়ে এক-একটি চিত্র বা চিত্রসমষ্টির ওপর ঝোঁক আসে। কবিদের পক্ষে এটা একটা ত্রুটী।

চিত্রের সাহায্যে আবেগ-সঞ্চারের কাজটি দু'ভাবে সিদ্ধ হতে পারে,—(১) বর্ণনা, অথবা (২) সংকেতের সাহায্যে। অবশ্য অনেকসময়ে একসংগে এই দুটী পদ্ধতিই ক্রিয়াশীল হয়। চিত্রধর্মী কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাকালে দরকার হয় এই শ্রেণী-বিভাগের। নচেৎ সমালোচকের পক্ষে কবির মনোভাব এবং কবিতার স্বরূপ ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না।

সংকেতধর্মী চিত্রণের পক্ষে রূপক-অলংকার সবচেয়ে উপযোগী। ভালো কবির হাতে

পড়লে রূপকের রূপ খোলে। যথার্থ কবি-প্রতিভার অধিকারীরাই রূপকের সার্থক প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখাতে পারেন। বিভিন্নধর্মী বস্তু বা ঘটনাকে নতুন যোগসূত্রে বাঁধতে রূপকের ক্ষমতা অসীম। রূপকের সহায়তায় চেনাজগতের মতো অচেনাজগতেরও সম্পূর্ণ ধারণা করে নেওয়া যায়। রূপক-অলংকারের সার্থক প্রয়োগে সোনা ফলে। অবশ্য চিত্রণধর্মী কবিতার সার্থকতার মূলে অন্যান্য অলংকারের অবদান-ও কম নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কাব্য বা কবিতার সমালোচনা করতে হলে প্রথমেই আলোচ্য কাব্য বা কবিতার অর্থটি বুঝতে হবে। তারপর দেখতে হবে কবির উদ্দেশ্য কী? এরপর দেখতে হবে কবির ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যর সংগে তাঁর রচনা-রীতির কতোখানি সংগতি বা সামঞ্জস্য আছে। এই তিনটী বিষয় যত্নসহকারে লক্ষ্য করে তারপর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। শেষ সিদ্ধান্তটি সমালোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শেষ সিদ্ধান্তটি সুদৃঢ় সুস্পষ্ট এবং ব্যক্তিপ্রধান হওয়া দরকার। একারণে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ধৈর্য-সহকারে কাব্য বা কবিতাটী পুনরায় পাঠ করে তারপর বলা উচিত যে কাব্য বা কবিতাটি সামগ্রিকভাবে সমালোচকের মনে কি ছাপ রাখলো।

গীতা ঘোষ

স মা লো চ না

কুলীন-কুল-সর্বস্ব রামনারায়ণ তর্করত্ন। ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। সৃষ্টি প্রকাশনী, ১৪১বি, ব্রাহ্ম-সমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪। মূল্য তিন টাকা।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে সার্থক কোন নাটকের অস্তিত্ব ছিল না। নাটক ছিল না একথা হয়তো বলা যায় না। নাটক অভিনয়ের প্রয়াস সৌখিন অপেশাদারী নাট্যামোদীরা ইংরেজি নাটক মঞ্চস্থ করে, সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে, পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে তাদের সখ মেটাতেন। বাংলা নাটকের অভাব বশতঃ তাদের এই নাট্যপ্রয়াস নিঃসন্দেহে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। জমে ওঠেনি সে সব অভিনয়। কিন্তু অভিনয়ের প্রয়াস, দর্শকের সামনে মঞ্চে অভিনয় করার স্পৃহা বেড়ে গিয়েছিল। বাংলা নাটক সৃষ্টির মূলে এই নাট্যামোদীদিগের উৎসাহ স্বীকার করতে হয়।

বাংলা নাটক লেখা না হলেও নাটক-সৃষ্টির ঐতিহ্য ছিল। ভারতবর্ষে নাট্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব ও তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।ইতিহাস-বিস্মৃত আনুমানিক সন তারিখ মিলিয়ে নানা যুক্তি দিয়ে ভারতের নাট্যশাস্ত্রকে গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের জনক প্লেটো আরিস্টটল অপেক্ষাও প্রাচীনতর—একথাও প্রমাণ করেছেন ঐতিহাসিকগণ। আমাদেরই এদেশে নাট্যশাস্ত্রকে 'পঞ্চমবেদ' বলা হত। নাটকের উৎপত্তি বিষয়েও নানা দেশে বিশেষ গ্রীস ও ভারতবর্ষে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে দেবাসুরের যুদ্ধ কাহিনী অথবা গ্রীসে দেবতা ডাওনিসাস ও কৃষ্ণকায় দানবের যুদ্ধকে অবলম্বন করে প্রথম নাটকের জন্ম হয়েছিল। সে যাই হোক নাটক ও তার অভিনয় সেই প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাহিত্যিক প্রকাশ-রূপে অভিনন্দিত হয়েছে।

অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সার্থক বাংলা নাটক সৃষ্টি হয়নি। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ মুসলমান আমলকে দায়ী করেছেন। এবং যুক্তি দিয়ে অনুমান করে থাকেন : পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসারের ফলে ইংরেজি নাটকের আদর্শে বাংলা নাটক সৃষ্টি হয়েছে কিংবা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা নাটকের উৎপত্তি। বাংলা ভাষায় লিখিত দৃশ্য কাব্যের উৎপত্তি বিষয়ে চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণলীলা অভিনয়কে অভিনয়ের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে তাঁরা অভিহিত করে থাকেন। সে যাই হোক অভিনয়ের প্রয়াস সেই প্রাচীন কাল থেকে বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, রসের প্রবাহে বাঙালীর আবেগ ও আকুলতাকে প্রকাশ করেছে—এ-বিষয় নিঃসন্দেহ। দৃশ্যকাব্যের আকারে বাংলা ভাষায় এইগুলি রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য, যাত্রা, পালাকীর্তন, লোকসঙ্গীত, লোক-গাথা, আখড়াই, তরজা, কথকতা, কবির লড়াই প্রভৃতিতে সেসব রস দানা বেঁধে উঠেছে। বাঙালীর জীবনের নিত্য প্রবহমানতার মধ্যে সে রসের একটা স্থায়ী আবেদন ভাবের প্রেমের আত্মোপলব্ধির ও জীবনদর্শনের ভিত্তিতে বাঙালীর জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্য মূলত এইগুলিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠছে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম নাট্য-সাহিত্যকে হয়তো এইগুলির মধ্যেই খুঁজলে পাওয়া যাবে।

নাট্যশালার ইতিহাস খুঁজতে গিয়েও আমাদের সেই অন্ধকার অতীতের মধ্যেই আশ্রয় নিতে হবে। যতদূর জানা যায় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাও খুব বেশি দিনের কথা নয়। হেরাসিম লেবেদেফ নামে জনৈক রুশীয় পরিব্রাজক ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালা স্থাপন করেন। The 'Disguise' ও 'Love is the best Doctor' নামে দুখানি নাটকের বাংলা অনুবাদ দুরাত্রি অভিনীত হয় এবং সে অভিনয়ে বাঙালী অভিনেত্রীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এটা কম আশ্চর্যের কথা নয়। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে লেবেদেফের নাম এবং তার প্রতিষ্ঠিত 'Bengally Theatre' নিঃসন্দেহে একটি যুগের প্রথম প্রয়াসরূপে চিহ্নিত হয়েছে। যদিও সেই প্রথম নাট্য প্রচেষ্টার পর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার পূর্বে আর কোন নাট্য প্রয়াস কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে দেখা দেয়নি—তাহলেও অনাগত যুগের পদধ্বনি সেদিন শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। বাঙালী কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে জুলিয়াস সীজারের নির্বাচিত দৃশ্য ভবভূতির 'উত্তর-রাম-চরিতে'র ইংরেজি অনুবাদ অভিনীত হয়। আর সর্বপ্রথম বাংলা নাটক বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান নাটকাকারে অভিনীত হয় নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালীর অভিনয় স্পৃহা অনুবাদের মাধ্যমে বা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে অবলম্বন করে মেটাতে হয়েছে, বাংলা ভাষায় মৌলিক কোন নাটক ছিল না বলেই।

বাংলা নাটকের সেই আদি পর্বে নাটক রচনার প্রেরণা যে ছিল না তা নয়। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' যথাক্রমে মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক দুখানি মৌলিক নাটক ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রচনা হিসাবে এই দুটি নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সম-সাময়িক কালে ইহারা সমাদর লাভ করেনি এমন কি অভিনীতও হয়নি। তা হয়তো নাটকের অনুৎকর্ষতার জন্যই। তাহলেও বাংলা নাটক রচনার ধারার সূত্রপাত এঁদুটি নাটক থেকেই—পরবর্তী কালের নবনাট্য আন্দোলনের মর্ম দিয়ে যার প্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে সমাজ জীবনের উপর ভিত্তি করে বয়ে চলেছে তার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে একথা ঐতিহাসিক-গণ স্বীকার করেন।

প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। ইতিপূর্বে সমসাময়িক বাংলার সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপ বিশেষত, মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়নি। যেকথা নাটক রচিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি হয় রোমান্টিক নয় পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করে, তা বাংলা ভাষায় রচিত হলেও প্রকৃত সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। সর্বপ্রথম রামনারায়ণ দেখালেন বাস্তব সমাজভিত্তিক মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হতে পারে। বাঙালীর প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনভিত্তিক সামাজিক নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' তৎকালীন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তী-কালে বহুনাটকের স্রষ্টা রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটকে রামনারায়ণ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের গৃহে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় রজনী উপলক্ষ্যে ১৮৫৮ সনে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় যে অভিমত প্রকাশিত হয় তা থেকে এই নাটক যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা সমাক উপলব্ধি করা যায় : 'The acting of the Koolin-Koolo-Shurboshwo Natuck at Chinsurah has, it appears, given great offence to the Koolins of the locality...

The acting took place in the house of a gentleman of the Banya caste, and the Koolin Brahmins intend, it is said, to retaliate in kind'.

এই নাটকের মূল অবলম্বন তৎকালীন সমাজের যাঁরা শিরোমণি সেই কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের বহু বিবাহ প্রথা। বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত কুলীন সমাজের বহু বিবাহ প্রথা, মেল বন্ধন ইত্যাদি নানা সামাজিক বিধিনিষেধ দেহের দুষ্ট ক্ষতের মত সমগ্র সমাজকে পঙ্গু ও অকর্মন্য করে ফেলেছিল। এই বিধিনিষেধের সুযোগে সমাজের একাংশ যারা কুলীন তাদের বিবাহ-ব্যবসার পণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল বাঙলার অনূঢ়া কুলীন কন্যাদের। সমাজে ভঙ্গজ হবার ভয় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা উপযুক্ত কুলীন পাত্রে বিবাহ দিতে না পারায় তাদের কন্যারা কুমারীই থেকে যেতেন। যদি বা বিবাহ হত পাত্রের বয়স শিক্ষা রূপলাবণ্য কিছুই বিচার করা হত না, শুধু কুলীন হলেই হল। এই কৌলীন্য প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি দেয়া হত তৎকালীন কুলীন কন্যাদের। রামনারায়ণ এই নাটকরচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন : 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যে রূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাবসম্বলিত 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক' রচনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছ থেকে তিনি পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক পেয়েছেন। 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক রচনার মূলে মোটামুটি এইটুকু ইতিহাস।

যে উদ্দেশ্যেই এ-নাটক রচিত হয়ে থাক, সেকালে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে শ্লেষ, কটাক্ষ, বিদ্রূপ ও পরিহাসের মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যক্তিচরিত্রগুলিকে উপস্থাপনা করা সহজ কথা নয়। বিশেষ যে সামাজকে তিনি ব্যঙ্গোক্তি করেছেন তিনি নিজে সেই সমাজেরই একজন। রামনারায়ণ নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সমাজভুক্ত ব্যক্তি। সমাজে বাস করে সেই সমাজের প্রতিভূ হয়ে বল্লালী কুলীন সমাজের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব চরিত্র ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব দুঃসাহসের পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

আজকের দিনের নাটক বিচার ও বিশ্লেষণের চুলচেরা হিসাবে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক তার উৎকর্ষের দিকে অনেকখানি হয়তো ম্লান হয়ে যাবে। বিশেষ সেকালের সামাজিক সমস্যা আজকের দিনের অর্থনৈতিক সমাজে তেমন করে আমাদের ভাবিয়ে তোলে না, নতুনতর নানা সমস্যা এসে আমাদের চিন্তা ও প্রকাশকে অন্যদিকে নির্দেশ দিচ্ছে, অন্যতর ইঙ্গিত নিয়ে আসছে। তবু সেকালের দিকে দৃষ্টি ফেরালে রামনারায়ণকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিনে নাটুকে রামনারায়ণকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিনে অতীতের বিস্মৃতপ্রায় নাটকের সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক হিসাবে এর ঐতিহাসিক মূল্য অনেক।

প্রায় শতাব্দীকাল পরে সম্প্রতি এই নাটকখানি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা নাট্যসাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সুষ্ঠুভাবে নাটকটি সম্পাদনা করেছেন। আধুনিক সমালোচনার দৃষ্টিকোণে অপূর্বভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি একটি সুচিন্তিত দীর্ঘ ভূমিকায় অধুনা-বিস্তৃত অথচ গুরুত্বপূর্ণ নাটকখানির সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্যের নতুন করে মূল্যায়ন করেছেন। এই গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে সাহিত্য পাঠক মাত্রেরই অভিনন্দনযোগ্য এবং বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান নাট্য-সংযোজনারূপে নাট্যামোদীদিগের কাছে আদৃত হবে।

রতন সান্যাল

রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েক দিক। ডাঃ আদিত্য ওহদেদার, এসোসিয়েটেড পাব্লিশার্স, এ/৯, কলেজ স্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪·৫০।

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ। বাণী রায়, মুখার্জী বুক হাউস, ৫৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্, কলিকাতা-৬, মূল্য ৩·৫০।

ইতিপূর্বে ডাঃ ওহদেদারের লিখিত 'রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা' গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে আদৃত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানির আলোচনার বিষয়—কাব্যনাট্য ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান, বিনোদিনী, চোখের বালি ও উমা, রবীন্দ্রকাব্যে রঙ, হাসিরভাষ্যে বার্গস' ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র বীক্ষায় নারীর মন, ইয়েটস-রবীন্দ্রনাথ সংবাদ, রবীন্দ্র-চিন্তায় ট্রাজেডির ফলশ্রুতি, রবীন্দ্রনাথ ও নদী, ও জোড়াসাঁকো।

প্রবন্ধগুলির অনেকগুলি বিষয় বস্তু সম্পূর্ণ নূতন, নানাস্থানে লেখক তাঁহার স্বীয় গবেষণালব্ধ নূতন তথ্য মৌলিক চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রচর্চায় ডাঃ ওহদেদারের এই নূতন সংযোজন রবীন্দ্রালোচনার পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে—এজন্য তিনি রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক সমাজের ধন্যবাদার্হ।

বাণী রায় বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম, ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব স্বীকৃত। জনপ্রিয় লেখক ও শিল্পীদের সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের অপরিসীম কৌতূহল আছে—এই কারণে এই গ্রন্থের "দেশে" বিভাগে কবি জীবনানন্দ দাশ, অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি মোহিতলাল মজুমদার, কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবোধ সান্যাল সম্বন্ধে লেখিকার স্বীয় পরিচয় ও ধারণা-লব্ধ রেখা-চিত্রধর্মী রচনা (প্রফাইল) পাঠকের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। এই বিভাগে এই সঙ্গে 'প্রেরণার উৎস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী কাদম্বিনী দেবীর রেখা চিত্র দেওয়া হইয়াছে, রচনাটি সুখপাঠ্য হইলেও লেখিকার পরিচিত লেখক-শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে কাদম্বিনী দেবী যখন ছিলেন না, তখন এই রচনাবলী হইতে পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হইত। দুঃসাহস ও উগ্রতা বাণী রায়ের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই দুঃসাহস ও উগ্রতা কল্পনালোকচারী ও চারিনী নায়ক নায়িকাদের মুখে ও কার্যকলাপে প্রতিফলিত হইলে তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায়না। কিন্তু সামাজিক ও বাস্তব জীবনে শালীনতা ও মাত্রাজ্ঞান বাঞ্ছনীয়। পরিচিত শিল্পী লেখক অথবা তাঁহাদের বন্ধুগোষ্ঠী সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে লেখিকা স্থানে স্থানে সংযমের মাত্রা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, পুস্তকের কয়েকস্থানে তাঁহার কটুভাষণ পাঠকের মনঃপীড়ার কারণ হইতে পারে লেখিকা মহোদয়াকে একথা সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সমালোচকের কর্তব্য বলিয়াই মনে করি।

এই দোষ ত্রুটি হইতে মুক্ত বলিয়া বিদেশে অংশে—মিষ্ট্রাল, ক্যারোজিন ও সাদে, চার্লস ডিকেন্স, চার্লস আরোবেলা হান্ট ও উইলিয়াম কনগ্রীভ, গ্যেটে, মারলতে ব্রন্টে ও উইলিয়ম হ্যাজলিট প্রভৃতির জীবনালেখ্য অতিশয় সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

আজ ও আগামী কাল ॥ ডক্টর সুব্রতেশ ঘোষ প্রণীত। শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম ২·৫০ টাকা

বর্তমান কাল একটা দ্রুত পরিবর্তনের যুগ। সত্যিকথা বলতে গেলে এই পরিবর্তনটা এতই দ্রুত যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ব্যবধান সম্বন্ধে সচেতন হবার আগেই ভবিষ্যৎ কাল বর্তমানের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে নিত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। মানব সমাজের ওপর এই সমস্যাগুলির আঘাত দেখিয়ে তার নিরসনের প্রচেষ্টা করেছেন ডাঃ সুব্রতেশ ঘোষ তাঁর এই বইখানিতে। মোট তেরটি নিবন্ধের উপর তাঁর বক্তব্যটি নিবেদন করা হয়েছে বিদগ্ধ পাঠক সমাজকে।

সমকালীন চিন্তাই লেখকের মূল বিষয়। এই সমকাল যে শুধু আজকের কথা নয়—দ্রুত পরিবর্তনের তাগিদে সেটা যে আগামী কালের অনেকটুকু জুড়ে রয়েছে,—প্রত্যেকটি প্রবন্ধের প্রত্যেকটি সমস্যার বিস্তৃতি এই সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে।। তাছাড়া আরও একটি কথা আছে। আজকে "সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী" ,কথাটার রূপও গেছে পাল্টে। কেবল ইতিহাস বা বিজ্ঞান অর্থনীতি বা রাজনীতি নিয়ে এক একটি মতবাদ বা আদর্শই সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করলে চলবে না, প্রয়োজন প্রতিটি সমস্যার সামগ্রিক আলোচনা,—যেটা সুব্রতেশ বাবুর আলোচনার বৈশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুব্রতেশ বাবু অর্থনীতিকে দেখেছেন সংস্কৃতির মাধ্যমে। রাজনীতিকে দেখেছেন দর্শনের মাধ্যমে। সংস্কৃতিকে দেখেছেন বুদ্ধিজীবী ও বিলাসিতার মাধ্যমে। এই বৈশিষ্টের জন্যই তাঁর আলোচনাগুলি হয়েছে ব্যাপক, হৃদয়গ্রাহী ও স্পষ্ট বক্তার ভূমিকা।

সমস্যাগুলির আলোচনা করা হয়েছে বিজ্ঞান সম্মতভাবে। ভাবালুতার আশ্রয় নিয়ে আদর্শ প্রচারের সহজ প্রচেষ্টায় না গিয়ে লেখক প্রথমে সমস্যাগুলির ব্যবচ্ছেদ করেছেন বিদগ্ধের মন নিয়ে। পরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক সমস্যাগুলি পূরণ করেছেন ব্যবহারিকের বাস্তব যুক্তির সাহায্যে। তাঁর বলিষ্ঠ সত্য ভাষণ সব সময় জনসাধারণের মনের মতন না হলেও সকলেরই বিচার্য্য বলে মনে হবে। "পরাভূত রবীন্দ্রনাথ," "উন্নাসিকতা প্রসঙ্গে," "উপেক্ষিত ভিত্তি" "বিলাসিতা প্রসঙ্গে" "ভবিষ্যতের জন্য" ইত্যাদি নিবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সর্বশেষে একটি কথা বলতে চাই, আজকে, এই পুস্তকের আলোচ্য প্রায় সমস্ত সমস্যাগুলিই, বুদ্ধিজীবী মহলে আরাম কেদারায় শুয়ে আলোচিত হয়ে থাকে। ঠিক সেই আলোচনার অঙ্গ হলেও পুস্তকখানি যে তার যুক্তির ধূম্রজালে সমাজের বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলবে না তার প্রমাণ হবে নিবন্ধগুলির উপসংহারে। সমাধানের উপায় বাৎলানো হয়েছে বটে তবে গ্রহণ করা বা না করা পাঠকের ওপর ছেড়ে দেওয়া আছে বলেই এক্ষেত্রে বক্তব্যের মূল্যায়ন সম্ভব। লেখক বোধকরি সেই প্রয়োজনেই ভূমিকায় বলে নিয়েছেন যে তাঁর বক্তব্যগুলি প্রধানতঃ "সর্বজনের চিন্তার স্পষ্টতা ও ঋজুতার জন্য বহু চিন্তা ভাবনা ও মতবিনিময়ের প্রয়োজনে।"

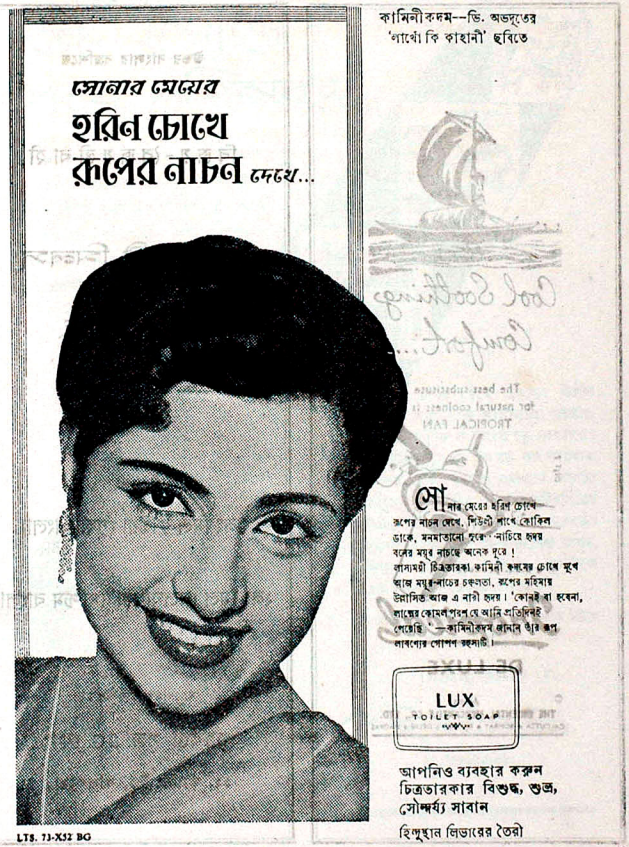

পুস্তকখানির বহুল প্রচার কাম্য।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র